ISSN-1813-0372

বর্ষ: ১২ সংখ্যা: ৪৭
জুলাই-সেপ্টেম্বর: ২০১৬

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকীয়

গবেষণাকে উন্নয়ন ও সামাজিক উৎকর্ষতার মানদণ্ড বিবেচনা করা হয়। গবেষণায় যারা যত অগ্রসর সামগ্রিক উন্নয়নে তাদের অবস্থান তত অগ্রগামী। কোন আদর্শ ও বিশ্বাসকে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গবেষণা সর্বোত্তম মাধ্যম। গবেষণার প্রভাব এতই বিস্তৃত যে, শুধুমাত্র এরই ভিত্তিতে মানুষ পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে চাঁদ ও মঙ্গলগ্রহে বসবাসের উদ্যোগ নিতেও দ্বিধান্বিত হয় না। মুসলিম উম্মাহ সাম্প্রতিককালে যে সংকট অতিক্রম করছে সম্ভবত ইতোপূর্বে কখনো তা মোকাবেলা করেনি। এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে মুসলিম উম্মাহ পশ্চাৎপদ নয়। এই পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ হলো, জ্ঞান-গবেষণায় তাদের পিছিয়ে পড়া। ইসলাম এমন একটি জীবন দর্শন যে, এখানে জ্ঞান-গবেষণাকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে বার বার গবেষণার কথা বলা হয়েছে। আসলে একটি জাতির সংকট মুহূর্তে সব কিছুতেই তার ছাপ পড়ে। তারা পিছিয়ে পড়েছে নেতৃত্বে, অর্থে, কৌশলে, পরিশ্রমে, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে। সারা দুনিয়ায় মুসলিম উম্মাহ এখন লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত ও উপেক্ষিত। এমনি দুরবস্থা হতে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে পারে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে ব্যাপক গবেষণা।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা হয়নি। অথচ এ দেশে ইসলাম সম্পর্কে গবেষণায় আগ্রহীর সংখ্যা অনেক। তাদের মধ্যে অনেকের মেধা ও প্রতিভা খুবই আশাব্যঞ্জক। কিন্তু বাংলা ভাষায় আধুনিক গবেষণা রীতি অনুসরণ করে মানসম্মত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রকাশের সমন্বিত উদ্যোগ না থাকায় তাঁরা প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এসব দিক বিবেচনায় এনে আজ থেকে এক যুগ পূর্বে 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' প্রকাশ করা শুরু করে ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল "ইসলামী আইন ও বিচার"। শুরু থেকে অদ্যাবধি কোন বিরতি ছাড়াই বাংলা ভাষাভাষি মানুষের কাছে ইসলামের আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ইসলামী সমাধান সম্বলিত প্রায় ৩০০ গবেষণা প্রবন্ধ এ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলামী আইন ও বিচার-এর বর্তমান সংখ্যাটি ৪৭ তম সংখ্যা। এ সংখ্যায় আমাদের জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ৫টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যাতে অন্য সংখ্যার ধারাবাহিকতায় ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও আইনের তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি প্রখ্যাত মার্কিন গবেষক গ্রাহাম-ই ফুলার রচিত A World Without Islam-এর বুক রিভিউ স্থান পেয়েছে।

কোন গবেষণা বা মৌলিক রচনা সফলভাবে সম্পন্ন করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তা প্রকাশের প্রশ্ন আসে। কাগজ উদ্ভাবনের আগপর্যন্ত মানুষ গাছের ডাল, পাতা, হাড্ডি, পাথর ইত্যাদি বস্তুতে তাদের সৃষ্টিকর্ম লিখে রাখত। এক সময় কাগজ আবিষ্কার হলেও ছাপাখানা ছিল না। হাত দ্বারাই লেখার প্রয়োজন মিটানো হতো। লেখক বই-কিতাব লেখার পর অন্য লোক দ্বারা কপি করা হতো। তবে মুদ্রণযন্ত্র ও ছাপাখানা আবিষ্কারের পর বই-পুস্তক ছাপানোর ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচিত হয়। পর্যায়ক্রমে এটি একটি শিল্পে পরিণত হয়। যারই ধারাবাহিকতায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা দেয় গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনার প্রসংগ। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার জগতের গুরুত্বপূর্ণ এ অনুষঙ্গটির শরয়ী বিধান বর্ণিত হয়েছে "শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে।

ইসলামী জীবনব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি গবেষণা চলছে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স নিয়ে। কনভেনশনাল বিভিন্ন প্রডাক্টের শরীআহ অভিযোজন করে অথবা শরীআহর আলোকে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রডাক্ট আবিষ্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ প্রাণান্তকর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের গবেষণাপ্রসূত একটি প্রডাক্ট 'হায়ার পারচেজ' বা ভাড়ান্তে ক্রয়। দেশ ও ব্যাংক ভেদে এটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। প্রয়োগ পদ্ধতির ধরন ও প্রসিদ্ধির বিচারে 'আল-ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' (HPSM), 'আল-ইজারা আল-মুনতাহিয়্যা বিত তামলিক' (IMBT) ও 'আল-ইজারা ছুম্মা আল-বাই' (AITAB) এই তিনটি পরিভাষা সর্বাধিক পরিচিত। "ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রচলিত হায়ার পারচেজ: একটি শরয়ী বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে এ পরিভাষা তিনটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপনের পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রচলিত 'আল-ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' (الإجارة بالبيع تحت شركة الملك) বা Hire Purchase under Shirkatil Milk সংশ্লিষ্ট শরীআহ অনুষঙ্গসমূহের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণাসমূহের সর্বশেষ সংযোজন 'টেকসই উন্নয়ন'। পরিবেশকে ভিত্তি করে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০৩০) প্রণয়ন করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে প্রণয়ন করেছে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১)। ইসলাম যেহেতু মানুষের সব ধরনের চাহিদার ব্যাপারে সার্বিক বা পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে, সেহেতু টেকসই উন্নয়নও তার বাইরে নয়। ইসলামের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বজগতে মানুষের অবস্থান, এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য এবং দুনিয়ার সুযোগ সুবিধা বা নেয়ামত উপভোগ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত। তবে ইসলামের কাঙ্ক্ষিত টেকসই উন্নয়ন মানব জীবনের

অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই কিছু নিয়ম কানুন ও নীতিমালা দ্বারা বেষ্টিত। যাতে মানুষ বস্তুগত বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে ছুটতে যেয়ে লোভ-লালসা, অপচয়, জুলুম ও অত্যাচারে জড়িয়ে না পড়ে। টেকসই উন্নয়ন, জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন কৌশলের বিশ্লেষণ এবং এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে প্রণীত হয়েছে "টেকসই উন্নয়ন: একটি ইসলামী বিশ্লেষণ" প্রবন্ধ।

গবেষণার যে কয়টি সমার্থবোধক শব্দ রয়েছে তার মধ্যে 'ইজতিহাদ' একটি। বিধিবদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করে নতুন বিষয়ের শরয়ী বিধান গবেষণাই ইজতিহাদ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও জীবনের গতি ধারার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে মানুষ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছে। জীবনযাত্রায় যুক্ত হচ্ছে এমন সব বিষয়, কুরআন-সুন্নাতে সরাসরি যে সম্পর্কে কোন বিধান বর্ণিত হয়নি। ইসলামের গতিশীলতা ও উপযোগিতার প্রশ্নে এসব বিষয়ের শরয়ী বিধান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই আইন গবেষণা তথা ইজতিহাদ সম্পন্ন হয়। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে ইজতিহাদের ধরনও হয় ভিন্ন ভিন্ন। বর্তমানে মুজতাহিদ মুতলাকের অভাব ও সব ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান ধারণে মানুষের সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে সম্মিলিত ইজতিহাদ-বিধান উদ্ভাবনের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। সম্মিলিত ইজতিহাদের পরিচিতি, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা বিধৃত হয়েছে "যুগ সমস্যার সমাধানে সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক প্রবন্ধে।

ইসলামী ফিকহের একটি বিরাট অংশজুড়ে ওয়াকফ বিষয়ক আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা স্থান পেয়েছে। ওয়াক্ফ পুণ্যলাভের একটি উপায়। ইসলামে ওয়াক্ফ কেবল বৈধ রীতিই নয় বরং এমন এক প্রশংসনীয় পুণ্যের কাজ যার দ্বারা নিজের প্রিয় সঞ্চয়কে পছন্দনীয় কাজে নিয়োজিত করা হয় এবং সেবার এ ধারায় জীবনের পরম লক্ষ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করা যায়। "ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াকফ এবং ওয়াকফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ও ওয়াকফ আইন ২০১৩ : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াকফ, এর গুরুত্ব, বিভিন্ন যুগে এর ধরন, নীতিমালা, শর্তাবলি, ওয়াকফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ও ওয়াকফ আইন ২০১৩ এর পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে।

আইন ও বিচার" জার্নালের এ সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো প্রবন্ধ গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। প্রবন্ধগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭
জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬

শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা

ড. মোঃ মুহসিন উদ্দিন*
মুফতী মহিউদ্দীন কাসিমী**

Copyright Protection and Sale in the light of the Sharī‘ah

ABSTRACT

The economic importance of an article is a testimony to the creativity of the mind of the writer. In this regard, the issue of copyright has attained importance in the context of the discovery of the printing press and the rise of the economic activities of publishing houses. As a result, there has arisen a necessity to understand the copyright concept in the light of Islam. Keeping this necessity in mind, the article presents the opinions of early and modern scholars the issue of copyright and a discussion on Shariah rulings pertaining to it. The article uses descriptive methods to prove that copyright is a type of wealth similar to other types of wealth. Every owner of wealth has the right to protect and sell his wealth. Thus the owner to a copyright has the right to protection and sale of goods as entitled to in lieu of his copyright.

Keywords: copyright; solid right; wealth; sharī‘ah.

সারসংক্ষেপ

লেখকের মস্তিষ্ক নিঃসৃত উৎপাদন হিসেবে লিখনীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব স্বীকৃত। বিশেষত মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক তৎপরতার প্রেক্ষিতে গ্রন্থস্বত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। ফলে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থস্বত্বের বিধান নির্ণয় সময়ের অনিবার্য প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। এ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে গ্রন্থস্বত্বের বিধান সম্পর্কে পূর্বসূরী ও আধুনিক আলিমগণের মতামত উপস্থাপন ও এর শরয়ী বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্যে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বনে রচিত এ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, গ্রন্থস্বত্ব অন্যান্য সম্পদের মতো একটি সম্পদ। প্রত্যেক মালিক নিজের সম্পদ সংরক্ষণ ও বিক্রির অধিকার রাখেন। তাই গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ করা ও এর বেচাকেনার পূর্ণ অধিকার গ্রন্থ প্রণেতার রয়েছে।

মূলশব্দ: গ্রন্থস্বত্ব; নিরেট স্বত্ব; সম্পদ; শরীয়াহ।

---

* চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ও ডীন, কলা অনুষদ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।
** মুহাদ্দিস, জামিয়া কাসিমিয়া নরসিংদী।

ভূমিকা

গ্রন্থস্বত্ব অর্থ যে কোন বিষয় সম্পর্কিত আক্ষরিক লিখিত রচনার মালিকানা। যে মালিকানা উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের অধিকার প্রদান করে। অতএব, গ্রন্থস্বত্ব বলতে কোন বই বা রচনাকর্ম প্রকাশ করার অধিকার। পৃথিবীতে হস্তলিপি আবিষ্কার হওয়ার পর থেকেই মানুষ লিখে আসছে। মনের ভাব প্রকাশের দুটি প্রধান মাধ্যম রয়েছে, বলা ও লেখা। কোন বক্তব্য ও বিষয় দীর্ঘদিন ধরে রাখার উৎকৃষ্ট উপকরণ হল লেখা। ভুলে গেলেও লেখা দেখে বিষয়টি মনে করা সম্ভব। তাই সর্বকালেই লেখার গুরুত্ব ছিল। কাগজ উদ্ভাবনের আগপর্যন্ত মানুষ গাছের ডাল, পাতা, হাড্ডি, পাথর ইত্যাদি বস্তুতে লিখত। একটি সময় কাগজ আবিষ্কার হলেও ছাপাখানা ছিল না। হাত দ্বারাই লেখার প্রয়োজন মিটানো হতো। সাধারণ পুস্তকের চেয়ে ধর্মীয় পুস্তক লেখার প্রতি গুরুত্ব ছিল বেশি। তবে মুদ্রণযন্ত্র ও ছাপাখানা আবিষ্কারের পর বই-পুস্তক ছাপানোর ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচিত হয়। বিশেষত আজকের আধুনিক যুগে বিশ্বের প্রতিটি দেশে কোটি কোটি বই, পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন ছাপা হচ্ছে। বরং প্রকাশনা একটি শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পূর্বকালে বাণিজ্যিকভাবে বইপুস্তক প্রকাশ ও বাজারজাতের তেমন ধারণা ছিল না। লেখক বই-কিতাব লেখার পর অন্য লোক দ্বারা কপি করা হতো। তারাও হাতেই কপি করত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বইপুস্তক ও কিতাবাদি প্রণয়নে মুসলমানদের বিস্ময়কর অবদান রয়েছে। তাঁরা হাত দ্বারাই কিতাব লিখেছেন। এসব মনীষী নিজেদের গ্রন্থের কোনো স্বত্ব রাখতেন, নাকি রাখতেন না– এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ইতিহাস জানা যায় না। তাঁদের পাহাড়সম নিষ্ঠা ও বইপুস্তকের বাণিজ্যিকীকরণ না থাকাও এর অন্যতম কারণ। কিন্তু বর্তমান যুগে গ্রন্থের স্বত্ব সংরক্ষণ করার যে ধারা শুরু হয়েছে, তা শরীয়তের আলোকে কতটুকু বৈধ? উপরন্তু, গ্রন্থস্বত্ব কোনো প্রকাশনীর বা ব্যক্তির কাছে বিক্রি করার বিধান কী?

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনার ব্যাপক প্রচলন শুরু হওয়ার পর ফকীহ ও মুজতাহিদগণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। শরীয়তের মূলনীতির আলোকে সমাধান দেওয়ার চেষ্টাও করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

গ্রন্থস্বত্ব ও তা প্রচলনের ইতিহাস

শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থস্বত্বের কয়েকটি প্রতিশব্দ রয়েছে, যেমন লেখকস্বত্ব, মেধাস্বত্ব, কপিরাইট ইত্যাদি। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো দ্বারা কোন মৌলিক রচনার অনুলিপি তৈরির অধিকারকে উদ্দেশ্য করা হয়। অতএব, গ্রন্থস্বত্ব বা কপিরাইট বলতে কোন কাজের উপর তার মূল রচয়িতা একক, অনন্য অধিকারকে বোঝানো হয়। কপিরাইটের চিহ্ন হলো ©। বিরাটাকার পরিব্যাপ্তিতে ছাপাখানার প্রসার হওয়ার আগ পর্যন্ত কপিরাইট বা মেধাস্বত্ব উদ্ভাবিত হয়নি। সতের শতকের শুরুর দিকে ছাপাখানাগুলোর একচেটিয়া আচরণের প্রতিক্রিয়ায় প্রথমে ব্রিটেনে

এরকম একটা আইনের ধারণা জন্ম নেয়। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় চার্লস বইগুলোর অনৈতিক অনুলিপি তৈরির ব্যাপারে সচেতন হয়ে রাজকীয় বিশেষাধিকার প্রয়োগ করে লাইসেন্স বিধিমালা ১৬২২ জারি করেন; এর ফলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত/অনুমোদিত বইগুলোর একটি নিবন্ধন তালিকা প্রণয়ন করে এর একটি অনুলিপি সমস্ত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে জমা রাখতে হয়। 'দ্যা স্টাচু অব অ্যান' ছিল মেধাস্বত্ব সংরক্ষিত প্রথম রচনাকর্ম, যা এর লেখককে নির্দিষ্ট সময়ের মেধাস্বত্ব প্রদান করে এবং সেই নির্দিষ্ট মেয়াদের পর মেধাস্বত্ব সমাপ্ত হয়ে যায়। তবে প্রথম কপিরাইট আইন প্রণীত হয় ১৭০৯ সালে ইংল্যান্ডে। ১৯১৪ সালের এক সংশোধনীর মাধ্যমে এ উপমহাদেশকে কপিরাইট আইনের আওতাভুক্ত করা হয়। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার ১৯১৪ সালের কপিরাইট আইন বাতিল করে ১৯৬২ সালে 'কপিরাইট অধ্যাদেশ' নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করে করাচিতে কেন্দ্রীয় কপিরাইট অফিস প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ঢাকায় একটি আঞ্চলিক কপিরাইট অফিস স্থাপন করা হয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে জাতীয় সংসদে অনুমোদিত আইনের মাধ্যমে ১৯৬২ সালের অধ্যাদেশের কিছু ধারা সংশোধন করে আঞ্চলিক অফিসকে জাতীয় পর্যায়ের দপ্তরের মর্যাদা প্রদান করে। সে সময় এ অফিসটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে কপিরাইট অফিসকে সংযুক্ত করা হয়। বর্তমানে কপিরাইট অফিস জাতীয় পর্যায়ের একটি আধা-বিচার বিভাগীয় (Quasi-judicial) প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য, ২০০০ সালে কপিরাইট আইন জারীর পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানী আমলের (১৯৬২ সালের) সংশোধিত অধ্যাদেশ ও ১৯৬৭ সালের কপিরাইট রুলস-এর আওতায় কাজ করেছে কপিরাইট অফিস, ঢাকা। সর্বশেষ ২০০৫ সালে ২০০০ সালের কপিরাইট আইনটি সংশোধন করা হয়।[১]

গ্রন্থস্বত্ব সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়

আরেকটি বিষয় এখানে প্রণিধানযোগ্য, গ্রন্থস্বত্বের সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি বিষয় রয়েছে। সেগুলোর বিধানও অনুরূপ। সবগুলো একই পর্যায়ের বিষয় এবং একই মূলনীতির অধীন। একটির বৈধতা-অবৈধতার ওপর সবগুলোর বৈধতা-অবৈধতা নির্ভর করে। যেমন:

০১. আবিষ্কার সম্পর্কিত অধিকার (حق الابتكار)। এটি একটি ব্যাপক শব্দ। এর অধীনে অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বইপুস্তক লেখা ও

---

১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: বাংলাপিডিয়া, ভুক্তি-কপিরাইট:
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=কপিরাইট;
https://bn.wikipedia.org/wiki/মেধাস্বত্ব;
https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ২৪-০৮-২০১৬

অনুবাদ করাও আবিষ্কার, কোনো যন্ত্রপাতি বানানো, ক্যালিগ্রাফি বা ডিজাইন, নকশা এসবও আবিষ্কার। এমনকি কোনো গান ও সাহিত্যও আবিষ্কার। প্রশ্ন হচ্ছে, এসবের উদ্ভাবনকারী এগুলোর স্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা করতে পারবেন কিনা?

০২. ব্যবসায়িক সুনাম বা ট্রেডমার্ক বেচাকেনা করা। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উৎকর্ষের এ যুগে ব্যবসায়িক সুনাম এবং কোম্পানির বিশেষ চিহ্নও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। একটি পণ্যই বিভিন্ন কোম্পানি বাজারজাত করে। সব কোম্পানির পণ্য একমানের হয় না। ভোক্তাদের বিশেষ কোম্পানির প্রতি ঝোঁক ও আকর্ষণ থাকে। তারা ওই কোম্পানির পণ্যই কিনতে চায়। তারা জানে, এ কোম্পানির সব পণ্যই উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। এ কোম্পানি নিজের ব্যবসায়িক সুনাম, ট্রেডমার্ক কিংবা লোগো বিক্রি করে দিতে পারবে কিনা?

০৩. ব্যবসায়িক ট্রেডমার্কের মতোই লাইসেন্সও বিক্রি করা হচ্ছে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই অনুমোদিত লাইসেন্সধারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কাউকে এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট করার অনুমতি দেয় না। প্রশ্ন হল, ব্যবসায়ের এ লাইসেন্স বিক্রি করা জায়িয কিনা?

০৪. আধুনিক এ বিষয়গুলোর মতোই প্রাচীন আরও কিছু বিষয় রয়েছে। যেমন : চলাচলের স্বত্ব (حق المرور), ছাদের উপরিভাগের স্বত্ব (حق التعلي), পানি চলাচলের স্বত্ব (حق التسييل), পানি পানের স্বত্ব (حق الشرب)। এ ধরনের আরও স্বত্বের বিষয় ফিকহের গ্রন্থসমূহে আলোচিত হয়েছে। সবগুলোকে ফিকহের পরিভাষায় 'নিরেট স্বত্ব' (الحقوق المجردة) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রবন্ধে আলোচিত বিষয় তথা গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনাও নিরেট স্বত্বের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নিরেট স্বত্বের বিধান জানা গেলেই গ্রন্থস্বত্বের বিধান জানা হয়ে যাবে। যদিও প্রত্যেকটি বিষয়ে সামান্য পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মূলনীতির বিচারে ফকীহগণ সবগুলোকে একই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

নিরেট স্বত্ব (الحقوق المجردة)

নিরেট স্বত্ব বা الحقوق المجردة পরিভাষাটি হানাফী মাযহাবের একটি ফিকহী পরিভাষা। অর্থাৎ অন্যান্য মাযহাবে এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়নি। পরিভাষাটি এককভাবে হানাফী মাযহাবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণ, হানাফীগণ কোন হক বা অধিকার ও উপকারিতাকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করেন না। ফলে যা সম্পদ নয় তার বিনিময়ও সম্ভব নয়। এটি উক্ত মাযহাবের অন্যতম মূলনীতি। কিন্তু শরীয়তের নস দ্বারা এমন অনেক হক বা অধিকার প্রমাণিত, যা কোন কিছুর ক্ষতিপূরণ বা বিনিময় হিসেবে

সাব্যস্ত হয়। যেমন নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের কিসাসের অধিকার, যা মূলত অন্যায় হত্যার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সাব্যস্ত হয়। এ কারণে এ জাতীয় ক্ষেত্রে মাযহাবের মূলনীতি ও শরীয়তের দলীলের সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়। এ বৈপরীত্য নিরসনের জন্য তারা যেসব হক সত্তাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত বা স্থির এবং যেসব হক বা অধিকার সত্তাগতভাবে সাব্যস্ত নয় এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন। হানাফীগণ এ পরিভাষার প্রবক্তা হলেও পূর্বসূরীগণ এর কোন সংজ্ঞা প্রদান করেননি। আধুনিক কোন কোন আলিম এর সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়াস নিয়েছেন। সামী হুবাইলী বলেন:

هو اختصاص بمنفعة غير متقرر في محله

ঐ উপকারিতা সংশ্লিষ্ট হক যা সত্তাগতভাবে সাব্যস্ত নয়।[২]

অর্থাৎ এটি কোন কিছুর সাথে সংযুক্ত এমন অধিকার, যা গ্রহণ বা বর্জন করলে বিধানের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আসে না। এর অধিকারটি তার স্বত্বাধিকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি চাইলে তা গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন। নিরেট স্বত্ব আর্থিক ও অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

মতানৈক্যের উৎস

নিরেট স্বত্বের বিধান সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ মতানৈক্যের মূল উৎস ও কারণ হচ্ছে, সম্পদের সংজ্ঞায় তাদের মতভিন্নতা। মাল বা সম্পদের সংজ্ঞায় পার্থক্যের কারণে গ্রন্থস্বত্বের বিধান এবং নিরেট স্বত্বসমূহের বিধানেও পার্থক্য দেখা দিয়েছে। তদ্রূপ বেচাকেনার (البيـــع) সংজ্ঞা নির্ণয়েও মতভেদ রয়েছে। মূলত বেচাকেনার সংজ্ঞা নির্ভর করে মালের সংজ্ঞার ওপর। কারণ, কোন জিনিস মাল বা সম্পদ হিসেবে গণ্য হলেই তার বেচাকেনা বৈধ। আর মাল হিসেবে গণ্য না হলে বেচাকেনাও অবৈধ হবে। একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলেও আমরা পৃথকভাবে সম্পদ ও বেচাকেনার সংজ্ঞা মতানৈক্যসহ উল্লেখ করব। এর দ্বারা গ্রন্থস্বত্বের বিধান জানতে সহজ হবে।

সম্পদ বা মালের সংজ্ঞা

হানাফীদের অভিমত

সম্পদের আরবী প্রতিশব্দ হল মাল (مـــال)। সম্পদের সংজ্ঞা নির্ধারণে হানাফী ফকীহদের মাঝেও মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. [১০২৫-১০৮৮হি.] বলেন :

والمراد بالمال عين يجري فيه التنافس والابتذال

২. সামী হুবাইলী, *আল-হুকুক আল-মুজাররাদা* (জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকহ ও উসূলে ফিক্হ বিভাগে উপস্থাপিত এম. এ থিসিস; ২০০৫খ্রি.), পৃ. ২৪

মাল বলতে ওইসব বস্তু বোঝায়, যা অর্জনে ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা হয়।[৩]

এই সংজ্ঞা স্পষ্ট প্রমাণ করে, মাল দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়ানুভূত বস্তুসমূহের মাঝে সীমাবদ্ধ। সুযোগ-সুবিধা ও নিরেট স্বত্ব সম্পদ বলে পরিগণিত হবে না। বিষয়টি খোলাসা করে মালের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ্ শায়খ মুস্তফা আয্‌যারকা রহ.। তিনি বলেন :

المال هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس

প্রত্যেক ওই বস্তুকে মাল বলা হয়, যা মানুষের মাঝে বস্তুগত অবয়ববিশিষ্ট এবং মূল্যমানসম্পন্ন বলে পরিচিত।[৪]

নিরেট স্বত্ব ও সুযোগ-সুবিধা হানাফীদের মতে মাল না হওয়ায় এর বেচাকেনাও নাজায়িয। তাই তাঁরা ছাদের উপরের শূন্যস্থান, পানি প্রবাহের অধিকার, চলাচলের অধিকার ইত্যাদি স্বত্ব ও অধিকার বেচাকেনাকে অবৈধ বলেছেন।

আল্লামা কাসানী রহ. [মৃ. ৫৮৭ হি.] বলেন :

سُفْلٌ وَعُلْوٌ بين رَجُلَيْنِ انْهَدَمَا فَبَاعَ صَاحِبُ الْعُلْوِ عُلْوَهُ لم يَجُزْ لِأَنَّ الْهَوَاءَ ليس بِمَالٍ

একব্যক্তি নিচের ঘরের মালিক, আরেকজন উপরের মালিক। উভয় ঘর ধ্বংস হয়ে গেল। এখন উপরের ঘরের মালিক তার অংশ বিক্রি করতে চাইলে বৈধ হবে না। কারণ, উন্মুক্ত ও শূন্যস্থান মাল নয়।[৫]

বিশিষ্ট ফকীহ্ ইবনুল হুমাম রহ. [৭৯০-৮৬১ হি.] উল্লেখ করেন:

إِذَا كَانَ السُّفْلُ لِرَجُلٍ وَعُلْوُهُ لآخَرَ فَسَقَطَا أَوْ سَقَطَ الْعُلْوُ وَحْدَهُ فَبَاعَ صَاحِبُ الْعُلْوِ عُلْوَهُ لَمْ يَجُزْ . لأَنَّ حَقَّ التَّعَلِّي لَيْسَ بِمَالٍ لأَنَّ الْمَالَ مَا يُمْكِنُ إِحْرَازُهُ

যদি কোন গৃহের নিচতলার মালিকানা একজনের এবং উপরের তলা অন্যজনের হয়; অতঃপর উভয় তলা বা উপরের তলা ভেঙ্গে যায় এবং উপরের তলার মালিক তার অংশটি বিক্রি করে, তবে তার এ বিক্রি অবৈধ। কারণ, উপরের অংশ কোনো মাল নয়। মাল তো বলা হয় যা সংরক্ষণ করা সম্ভব।[৬]

---

৩. আলা উদ্দীন আল-হাসকাফী, *আদদুররুল মুনতাকা* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩

৪. ওয়াহাবাহ আল-যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু* (দামিশকঃ দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫হি.), খ. ৪, পৃ. ৩

৫. আবূ বকর মুহাম্মদ আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে'ফী তারতীবিশ শারায়ে'* (বৈরূতঃ দারুল মা'আরিফ, ২০০০খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৪৫

৬. কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, *শরহু ফাতহুল কাদীর* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৭৮

মালিকীদের মত

মালিকী ফকীহদের পরস্পরবিরোধী মতামত থাকলেও প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত অনুযায়ী মাল হওয়ার জন্যে বস্তু (عَيْن) হওয়া আবশ্যক নয়। নিরেট স্বত্ব, উপকারিতা এবং সুযোগ-সুবিধাও মাল হতে পারে।

আবু ইসহাক শাতিবী রহ. [মৃ. ৭৯০ হি.] বলেন :

المال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك.

মাল বলা হয়, যে বস্তুর মালিকানা অর্জনযোগ্য হয় এবং মালিক তাতে একক কর্তৃত্ব করে থাকে।[৭]

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী যারকানী রহ. [১০৫৫-১১২২ হি.] বলেন :

البيوع جمع بيع وجمع لاختلاف أنواعه كبيع العين وبيع الدين وبيع المنفعة

البيوع শব্দটি بيع এর বহুবচন। এখানে বহুবচন ব্যবহার করার কারণ, বেচাকেনার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন দৃশ্যমান বস্তুর বেচাকেনা, মুদ্রা বেচাকেনা এবং সুযোগ-সুবিধা বেচাকেনা করা।[৮]

আল্লামা মাউওয়াক রহ. [মৃ. ৮৯৭ হি.] বলেন :

يجوز في قول مالك شراء طريق في دار رجل وموضع جذوع من حائط يحملها عليه إذا وصفها

ইমাম মালিক রহ. এর মতে, কোনো ব্যক্তির বাড়ির আঙিনায় রাস্তা বেচাকেনা এবং দেয়ালে খুঁটি স্থাপনের জায়গা বেচাকেনা জায়িয। তবে শর্ত হল, উভয় ক্ষেত্রে সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।[৯]

মালিকীদের মতে উপকারিতাও মোহর হতে পারে। সুতরাং উপকারিতা মাল হিসেবে গণ্য হল। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ফকীহ জাযীরী রহ. [১২৯০-১৩৬০ হি.] বলেন,

وأما المنافع من تعليمها القرآن ونحوه . أو سكنى الدار. أو خدمة العبد ففيها خلاف فقال مالك : إنها لا تصلح مهرا ابتداء أن يسميها مهرا وقال ابن القاسم: تصلح مهرا مع الكراهة وبعض الأئمة المالكية يجيزها بلا كراهة والمعتمد قول مالك طبعا. ولكن إذا سمى شخص منفعة من هذه المنافع مهرا فإن العقد يصح على المعتمد ويثبت للمرأة المنفعة التي سميت لها وهذا هو المشهور.

---

৭. ইবরাহীম ইবন মূসা আশশাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত ফী উসূলিশ শরীআহ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৪খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৭

৮. মুহাম্মদ আয-যারকানী, *শারহুস যারকানী আলাল মুআত্তা* (বৈরূতঃ আল-মাতবাআহ আল-খাইরিয়্যাহ, ২০১০খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩২৩

৯. মুহাম্মদ ইবন ইউসূফ আল-আবদারী আল মাউওয়াক, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল লিমুখতাসারি খালীল* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৪খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৭৫

নিরেট উপকারিতা; যেমন কুরআন শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি অথবা ঘরে বসবাস করা কিংবা গোলামের সেবা গ্রহণ– এগুলোতে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালিক রহ. বলেন, প্রাথমিকভাবে ও মূলত এসব মোহর হওয়ার উপযুক্ত নয়। ইবনুল কাসিমের মতে, জায়েয তবে মাকরূহ। আর কতিপয় মালিকী ইমাম মাকরূহ ছাড়াই জায়িয বলেছেন। স্বভাবত ইমাম মালিকের মতটিই নির্ভরযোগ্য হওয়া কথা; কিন্তু কেউ যদি এসব উপকারিতার কোনো একটিকে মোহর হিসেবে নির্ধারণ করে ফেলে, তাহলে নির্ভরযোগ্য মতে বিবাহ-চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। আর ওই নারী নির্ধারিত মোহর পাবে। এটিই প্রসিদ্ধ অভিমত।[১০]

শাফিয়ীদের মত

শাফিয়ী ফকীহদের মতে, মাল হওয়ার জন্য বস্তু (عَيْن) হওয়া জরুরি নয়। নিরেট স্বত্ব ও উপকারিতাও মাল হতে পারে। তাই তাঁদের মতে নিরেট উপকারিতা ও সুযোগ-সুবিধাও বেচাকেনা করা যায়।

আল্লামা ইবনে হাজার আলহাইতামী রহ. [৯০৯-৯৭৪ হি.] বেচাকেনার সংজ্ঞায় বলেন:

الْبَيْعُ لُغَةً مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

'বায়' (বেচাকেনা) এর শাব্দিক অর্থ, বস্তুকে বস্তুর বিনিময়ে অদলবদল করা। আর পরিভাষায় 'বায়' বলা হয়, এমন চুক্তি যার মাঝে পরবর্তীতে বর্ণিত শর্তাবলির আলোকে মালের বিনিময়ে মালের লেনদেন হবে, যাতে করে এ চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট বস্তুর মালিকানা অথবা স্থায়ী সুবিধার মালিকানা অর্জিত হয়।

শায়খ আবদুল হামীদ আশশিরওয়ানী উপর্যুক্ত সংজ্ঞায় ব্যবহৃত مُؤَبَّدَةٍ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন:

(وَقَوْلُهُ : مُؤَبَّدَةٍ) كَحَقِّ الْمَمَرِّ إذَا عَقَدَ عَلَيْهِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ .

স্থায়ী সুবিধা; যেমন চলাচলের অধিকার। যখন বেচাকেনার শব্দ দ্বারা চুক্তি সংঘটিত হয়।[১১]

এর দুই পৃষ্ঠা পর কতক শাফিয়ী আলিমের মত উল্লেখ করা হয় এভাবে :

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ تُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ .

এমন আর্থিক বিনিময় চুক্তিকে বেচাকেনা বলা হয়, যা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট বস্তু অথবা কোনো উপকারিতার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

---

১০. আব্দুর রহমান আল-জাযীরী, *আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৫৯

১১. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাজর আল-হাইতামী, *তুহফাতুল মুহতাজ ফী শারহিল মিনহাজ* (মিসরঃ আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১৩৫৭হি./১৯৮৩খ্রি.), খ. ১৬, পৃ. ২১২

আল্লামা শাতিবী রহ. [মৃ. ৭৯০ হি.[বলেন:

البيع لغةً : مقابلة شيء بشيء ، وشرعًا : عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد ، كما في بيع حق الممر ، ووضع الأخشاب على الجدار ، وحق البناء على السطح.

শাব্দিকভাবে 'বায়' বলা হয়, এক জিনিসের মাধ্যমে অন্য জিনিস বিনিময় করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় বেচাকেনা হচ্ছে, মূল্যমানবিশিষ্ট সম্পদ লেনদেনের চুক্তি, যার মাধ্যমে কোনো বস্তু কিংবা কোনো স্থায়ী উপকার ও সুযোগ-সুবিধার মালিকানা অর্জিত হয়। যেমন চলাচলের অধিকার, দেয়ালের ওপর কাঠ রাখার স্বত্ব এবং ছাদের ওপর ঘর বানানোর অধিকার বেচাকেনা করা।[১২]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. [৮৪৯ - ৯১১ হি.] উল্লেখ করেন:

أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك

মালের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন: ওইসব জিনিসকে মাল বলা হয়, যার মূল্য রয়েছে, যদিও তা অল্পই হয়। এর মাধ্যমে বেচাকেনা করা যায় এবং তা বিনষ্ট করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগে আর তা এমনিতেই ফেলে দেওয়া হয় না। যেমন : টাকা-পয়সা।[১৩]

আল্লামা সুয়ূতী রহ. এর এ সংজ্ঞা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, কোনো বস্তু মাল বিবেচিত হওয়া ও না হওয়ার ক্ষেত্রে উরফ, রেওয়াজ ও প্রচলনের ভূমিকাই মুখ্য। যে বস্তু মানুষের ব্যবহার ও প্রচলনে মূল্যমান বলে গণ্য হয় এবং যা বিনষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়– তাই মাল।

হাম্বলীদের মত

হাম্বলী ফকীহদের মতেও মাল হওয়ার জন্যে দৃশ্যমান বস্তু হওয়া জরুরি নয়। উপকারিতা এবং সুযোগ-সুবিধাও মাল হতে পারে। তাই এসবের কেনাবেচা করাও জায়িয। তাঁদের অভিমতও শাফিয়ী ও মালিকীদের অনুরূপ।

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী আল-বাহুতী রহ. [১০০০-১০৫১ হি.] বলেন:

مبادلة عين مالية ... أو مبادلة منفعة مباحة مطلقا بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر كممر دار أو بقعة تحفر بئرا .

---

১২. মাজাল্লাহ মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী : খ. ৬, পৃ. ১৯২৬

১৩. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩খ্রি.), পৃ. ৩২৭

মূল্যমানবিশিষ্ট অথবা সাধারণভাবে বৈধ সুযোগ-সুবিধার লেনদেনকে বেচাকেনা বলা হয়; যার বৈধতা কোনো একটি বিশেষ অবস্থার সঙ্গে নির্দিষ্ট হবে না। যথা- বাড়ির চলাচলের রাস্তা অথবা ভূমির যে অংশে কূপ খনন করা হয়।[১৪]

আলী ইবনে সুলায়মান আল-মিরদাবী রহ. [৮১৭-৮৮৫ হি.] বলেন :

هو مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما كذلك على التأبيد فيهما بغير ربا ولا قرض

কোনো দৃশ্যমান বস্তু অথবা সাধারণ বৈধ সুযোগ-সুবিধা একটিকে অপরটির বিনিময়ে স্থায়ীভাবে লেনদেন করা– সুদ ও ঋণ ব্যতীত।[১৫]

বিশিষ্ট হাম্বলী ফকীহ ইবনে কুদামাহ রহ. [৫৪১-৬২০ হি.] বলেন :

أن الصداق لا يكون إلا مالا

'অবশ্যই মোহর মাল হতে হবে।'

একই কিতাবে আরও বলেন :

وكل ما جاز ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة من العين والدين والحال والمؤجل والقليل والكثير ومنافع الحر والعبد وغيرهما جاز أن يكون صداقا

কেনাবেচায় যা মূল্য এবং ইজারায় যা ভাড়া হওয়ার উপযুক্ত, চাই তা দৃশ্যমান বস্তু, টাকা-পয়সা, নগদ বা বাকি, কম বা বেশি এবং স্বাধীন ও ক্রীতদাসের উপকারিতা ইত্যাদি সবই মোহর হতে পারে।[১৬]

মতানৈক্যের সারকথা

হানাফী ব্যতীত বাকি প্রসিদ্ধ তিন মাযহাব– মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলীদের অভিমত হল, শুধু দৃশ্যমান বস্তুই মাল নয়; বরং অদৃশ্য উপকারিতা এবং সুযোগ-সুবিধাও মাল হতে পারে। সুতরাং দৃশ্যমান বস্তুর মতোই অদৃশ্যমান উপকারিতার বেচাকেনাও বৈধ হবে– যদি তা স্থায়ী হয়। হানাফীদের মতে, মাল বলতে কেবল দৃশ্যমান বস্তুকে বোঝায়। অদৃশ্যমান বস্তু; যেমন উপকারিতা ও সুযোগ-সুবিধা মাল বলে গণ্য নয়। যেহেতু তা মাল নয়, তাই তা বেচাকেনাও করা যাবে না।

এ হিসেবে গ্রন্থস্বত্বও একটি নিরেট স্বত্ব এবং সুযোগ-সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হানাফী ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহদের মতে এটি মাল-সম্পদ; তাই গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ করা এবং বিক্রি করা বৈধ।

---

১৪. মানসূর বিন ইউনূস আল-বাহুতী, *শরহ মুনতাহাল ইরাদাত*, তাহকীক: আব্দুল মুহসিন তুরকী (বৈরূত: আলিমুল কুতুব, ১৪১৪হি./ ১৯৯৩খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫

১৫. আলী ইবন সুলায়মান আল-মিরদাবী, *আল-ইনসাফ ফী মা'রিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ* (বৈরূত: মাতবাআতুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ, ১৯৫৬খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৮৮

১৬. মুওয়াফাকুদ্দীন আব্দুল ইবন আহমদ ইবন কুদামাহ, *আল-মুগনী* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছাহ, ১৪০১হি./১৯৮১খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৭, ১৪

ইতোপূর্বে আমরা হানাফীদের প্রাচীন ফকীহদের মতটি উল্লেখ করেছি। এর আলোকে গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা করা অবৈধ হয়; কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, হানাফীদের মাঝেও ভিন্নমত রয়েছে। তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

কতিপয় হানাফীর ইতিবাচক অভিমত

বর্তমান পৃথিবীতে হানাফীদের বিখ্যাত ফাতওয়াগ্রন্থ রদ্দুল মুহতারের লেখক ইবনে আবিদীন শামী রহ. [১২৪৪-১৩০৬ হি.] বলেন :

> الْمُرَادُ بِالْمَالِ مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَالْمَالِيَّةُ تَثْبُتُ بِتَمَوُّلِ النَّاسِ كَافَّةً أَوْ بَعْضِهِمْ ، وَالتَّقَوُّمُ يَثْبُتُ بِهَا وَبِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا.
>
> মাল দ্বারা ওইসব বস্তুকে বোঝায়, যার প্রতি মানবমন আকর্ষিত হয় এবং প্রয়োজনে সঞ্চয় করা যায়। সকল মানুষ অথবা কিছু মানুষ এটিকে মাল হিসেবে গণ্য করলেই তা মাল বলে বিবেচিত হবে। তদ্রূপ শরয়ীভাবে কোনো জিনিস হতে উপকৃত হওয়া বৈধ হলেও তা মাল হিসেবে পরিগণিত হবে।[১৭]

একই কিতাবের অন্যত্র বলা হয়েছে :

> الْمَالُ اسْمٌ لِغَيْرِ الْآدَمِيِّ ، خُلِقَ لِمَصَالِحِ الآدَمِيِّ وَأُمْكِنَ إِحْرَازُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِيَارِ
>
> মানুষ ছাড়া সব বস্তুকে মাল বলা যায়, যা মানবকল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা সংরক্ষণ করা যায়; এমনকি নিজের ইচ্ছেমতো লেনদেন করা যায়।[১৮]

এ দুটো সংজ্ঞার একটিও বেচাকেনাকে দৃশ্যমান বস্তুগত উপাদানের মাঝে সীমিত ও সীমাবদ্ধ করে না। বরং শরীয়তের অনুমোদন হলে এবং মানুষের ব্যবহার-প্রচলনে কোনো অদৃশ্য বস্তু মাল হিসেবে ব্যবহৃত হলে তাও মাল হতে পারে।

হানাফীদের প্রসিদ্ধ মতের বিপরীত হল এ মত। অনুসন্ধান করে দেখা যায়, কেবল আধুনিককালের হানাফী ফকীহবৃন্দই এমন ব্যতিক্রম মত পোষণ করেন না, কিছু প্রাচীন ফকীহও এমন অভিমত দিয়েছেন।

আল-হিদায়ার গ্রন্থকার বর্ণনা করেন, ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে 'সেবা' মাল বলে বিবেচিত। তাই কোনো স্বামী যদি স্ত্রীর সেবাকে মোহর হিসেবে নির্ধারণ করে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে এ নির্ধারণ করা বৈধ। তবে স্ত্রীর চেয়ে স্বামী মর্যাদায় এগিয়ে থাকায় সেবা করা সম্ভব না; সে কারণে সেবার মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক।

---

১৭. মুহাম্মদ আমীন ইবন উমর ইবন আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২০০০খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১৮৯

১৮. ইবন আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার*, খ. ১৮, পৃ. ১৯০

ثُمَّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ تَجِبُ قِيمَةُ الْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَالٌ

এমতাবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে, সেবার মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক। কারণ, মোহর হিসেবে উল্লেখিত 'সেবা' মাল হিসেবে গণ্য।[১৯]

ফকীহ আলাউদ্দীন আল-কাসানী রহ. [মৃ. ৫৮৭ হি.] বলেনঃ

وَلَوْ تَزَوَّجَهَا على مَنَافِعِ سَائِرِ الْأَعْيَانِ من سُكْنَى دَارِه وَخِدْمَةِ عَبِيدِه وَرُكُوبِ دَابَّتِه وَالْحَمْلِ عليها وَزِرَاعَةِ أَرْضِه وَنَحْوِ ذلك من مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ لِأَنَّ هذه الْمَنَافِعَ أَمْوَالٌ أو الْتَحَقَتْ بِالْأَمْوَالِ شَرْعًا في سَائِرِ الْعُقُودِ.

কেউ যদি দৃশ্যমান বস্তুর উপকারিতার বিনিময়ে বিবাহ করে, যেমন বাড়িতে বসবাস করা, ক্রীতদাসের মাধ্যমে সেবা করা, জন্তুর ওপর আরোহণ করা, জন্তুর মাধ্যমে বোঝা বহন করা, জমিন চাষ করা ইত্যাদি এবং এই উপকারিতার নির্ধারিত সময় থাকে, তাহলে এভাবে মোহর নির্দিষ্ট করা বৈধ। কারণ, এসব উপকারিতা মাল। আর সমস্ত চুক্তির ক্ষেত্রে এসব উপকারিতা শরীয়তের দৃষ্টিতে মাল হিসেবে পরিগণিত হবে।[২০]

এভাবে আরও অনেক ফকীহ হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ অভিমতের বিপরীতে মত প্রকাশ করেন। তা দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, তাঁদের মতেও নিরেট স্বত্ব এবং উপকারিতাও মাল বলে গণ্য।

মালের প্রাধান্যপ্রাপ্ত সংজ্ঞা

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর পর্যালোচনান্তে মালের প্রাধান্যপ্রাপ্ত সংজ্ঞা বর্ণনার পূর্বে সংজ্ঞা নির্ধারণের উৎস সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা প্রয়োজন। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো কিছুর সংজ্ঞা নির্ধারণে তিনটি উৎস রয়েছে। ১. শরীয়তপ্রণেতার পক্ষ হতে সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যেমন- সালাত, সওম, তালাক ইত্যাদি। ২. অভিধান ও আরবী ভাষা। অধিকাংশ ইসলামী পরিভাষা অভিধান ও ভাষার আলোকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। উদাহরণত কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশ দিয়েছে, অযু করো। অযুর অঙ্গগুলোর সংজ্ঞা অভিধানের আলোকে জানা গেছে। হাত-পা-নাক-মাথা এগুলোর সংজ্ঞা শরীয়ত বাতলে দেয়নি; অভিধান ও ভাষার সাহায্যে জানা যায়। ৩. উরফ-রেওয়াজ, প্রচলন ও সামাজিক রীতিনীতি ও জনগণের ব্যবহার। অগণিত পরিভাষার সংজ্ঞা উরফ থেকে নির্ধারিত হয়।

কুরআন-সুন্নাহয় 'মাল' শব্দটি অসংখ্যবার ব্যবহৃত হলেও কোথাও মালের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা পেশ করা হয়নি। কারণ, মালের সংজ্ঞা অত্যন্ত পরিচিত ও পরিজ্ঞাত ছিল।

---

১৯. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৭, পৃ. ১৫৪

২০. আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে*, খ. ২, পৃ. ২৭৯

ফলে বাতলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। আর অভিধানেও মাল শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। মালের আভিধানিক অর্থ শরীয়তে উদ্দেশ্য নয়।

নসে কোনো শব্দের অর্থ বিবৃত না হলে এবং অভিধানেও শব্দটির স্বচ্ছ ও পরিষ্কার কোনো পারিভাষিক অর্থ পাওয়া না গেলে উরফের আশ্রয় নেওয়াই বিধেয়। ফুকাহায়ে কিরাম এ সম্পর্কিত মূলনীতি বর্ণনা করে বলেছেন :

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

যে বিষয়ে শরীয়ত সাধারণ হুকুম দিয়েছে; শরীয়তে এবং অভিধানেও কোনো নীতিমালা বলে দেওয়া হয়নি, তখন বিষয়টির মর্ম উদঘাটনে উরফের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।[২১]

সুতরাং মালের সংজ্ঞা নির্ণয়ে মানুষের প্রচলনের ওপর নির্ভর করতে হবে। বিশেষত লেনদেন সম্পর্কে অধিকাংশ পরিভাষা প্রচলন দ্বারা জানা যায়।

অতএব, কুরআন-সুন্নাহ, অভিধান, ফুকাহায়ে কিরামের উদ্ধৃতি এবং মানুষের প্রচলন সামনে রেখে মালের প্রাধান্যপ্রাপ্ত সংজ্ঞা নির্ধারণে তিনটি মৌলিক বিষয় থাকা আবশ্যক। বিষয়গুলো হল :

০১. **শরীয়তে ওই জিনিসটি মুবাহ ও বৈধ হতে হবে :** বৈধ না হলে তা মাল হবে না। যেমন মৃতজন্তু ও মদ মাল নয়। কারণ, শরীয়তে এসব বেচাকেনা করা নিষিদ্ধ।

০২. **জিনিসটি উপকারযোগ্য হতে হবে :** ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে, রেশমপোকা ও রেশমের ডিম বেচাকেনা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ. অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মদের মতটিই গ্রহণযোগ্য ও এ মতানুযায়ীই ফাতওয়া দেওয়া হয়। এর কারণ কী? لِكَوْنِـهِ مُنْتَفَعًـا بِـهِ 'কারণ হল তা উপকারযোগ্য।'[২২] ইমাম যায়লাঈও একই কথা বলেছেন : أَنَّ الدُّودَ يُنْتَفَعُ بِهِ , وَكَذَا بَيْـضُهُ فِي الْمَـآلِ 'কারণ, এ পোকা দ্বারা উপকার অর্জিত হচ্ছে। আর পরবর্তী সময়ে এ পোকার ডিমও উপকারী হবে।'[২৩] মাজমাউল আনহুরের লেখক স্পষ্ট বলেছেন : وَالشَّيْءُ إِنَّمَا يَصِيرُ مَالًا لِكَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِـهِ 'কোনো বস্তু তখনই মাল হবে, যখন তা উপকারী হয়।'[২৪]

---

[২১] সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির*, পৃ. ৯৮

[২২] যায়নুদ্দীন ইবন নুজাঈম, *আল-বাহরুর রায়িক শরহ কানযুদ দাকাঈক* (বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল-ইসলামী, তারিখ বিহীন), খ. ৬, পৃ. ৮৫

[২৩] উসমান ইবন আলী আয-যাইলায়ী, *তাবয়ীনুল হাকায়িক শরহ কানযুদ দাকাঈক* (কায়রোঃ আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়্যাহ, ১৩১৩হি.), খ. ৪, পৃ. ৪৯

[২৪] দামাদ আফিনদী, *মাজমাউল আনহুর* (বৈরূতঃ দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তারিখবিহীন), খ. ৩, পৃ. ৮৪

ইমাম নববী রহ. জমিনের পোকা ও কীটপতঙ্গ বেচাকেনা করা হারাম বলেছেন। তবে মৌমাছির বেচাকেনা জায়িয বলে মত দিয়েছেন। কারণ, لأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ 'তা একটি পবিত্র পোকা এবং উপকারযোগ্য।'[২৫]

০৩. **তৃতীয় উপাদান : উরফ, সামাজিক প্রচলন ও ব্যবহার, জনসাধারণের রীতিনীতি :** হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী– সব মাযহাবই উরফের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রামাণিকতার বিষয়ে একমত। সুতরাং সামাজিক প্রচলনে যে জিনিস মাল বলে গণ্য হয়, শরীয়তেও তা মাল হিসেবে ধর্তব্য হবে। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী চমৎকার বলেছেন :

وَالْمَالِيَّةُ تَثْبُتُ بِتَمَوُّلِ النَّاسِ كَافَّةً أَوْ بَعْضِهِمْ

'সকল মানুষ অথবা কিছু মানুষের প্রচলন ও ব্যবহারের দ্বারা কোনো বস্তু মাল বলে গণ্য হয়।'[২৬]

সাধারণত আমাদের আলোচ্যবিষয় নিরেট স্বত্ব; বিশেষত গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা করা। দ্বিতীয় বিষয়টিই আমাদের মূল আলোচনার বিষয়।

ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি, প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরাম মালের এমন সংজ্ঞা দিয়েছেন, যা শুধু দৃশ্যমান বস্তুর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। অদৃশ্য বস্তু যা উপকারযোগ্য এবং স্থায়ী, তাও মাল বলে বিবেচিত। সুতরাং যেসব নিরেট স্বত্ব (الحقوق المجردة) সমাজে প্রচলিত, তা সংরক্ষণ করা হয়, বেচাকেনাও হয়; তাহলে এমন নিরেট স্বত্ব সংরক্ষণ করা বৈধ, বেচাকেনাও বৈধ। বিষয়টি ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে ইজমা বা ঐকমত্যের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। প্রাচীন ফকীহদের কয়েকজনের সংজ্ঞা দ্বারা মাল কেবল দৃশ্যমান বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও বাস্তবতা ভিন্ন। কারণ, তাঁদের আমলে সাধারণত অদৃশ্য বস্তু মাল হওয়ার কল্পনাই করা যেত না। কিন্তু বর্তমানে দৃশ্যপট সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর তাবৎ ফকীহ একমত পোষণ করেছেন যে, মাল কেবল দৃশ্যমান বস্তুর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; অদৃশ্য বস্তুও মাল হতে পারে। যদি তা উপকারী ও বৈধ হয় এবং মানবসমাজে এর প্রচলন থাকে। ফিকহ একাডেমি জেদ্দার গবেষকদের মতামতও তাই।[২৭]

---

২৫. শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নাভাভী, *আল-মাজমু শারহে মুহাযযাব* (জিদ্দা: মাকতাবাতুল ইরশাদ, তারিখবিহীন), খ. ৯, পৃ. ২২৭

২৬. ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ১৮, পৃ. ১৮৯

২৭. যেমন তাঁরা বলেছেন,

গ্রন্থস্বত্বের বিধান সম্পর্কে সমসাময়িক আলিমগণের অভিমত

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ, বেচাকেনা বা মীরাস হিসেবে রাখার বিধানের ক্ষেত্রে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। সমসাময়িক আলিমগণ এ বিষয়ে দুদলে বিভক্ত হয়েছেন।

এক: গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা বৈধ

একদল আলিমের মতে, গ্রন্থস্বত্ব একটি বৈধ বিষয়। অন্যান্য বস্তুর মতোই এটিও ব্যক্তির মালিকানায় থাকতে পারে। লেখক স্বীয় গ্রন্থের মালিক, স্বত্বাধিকারী। নিজের বৈধ মালিকানাধীন বৈধ জিনিসপত্র যেমন বিক্রি করা জায়িয, তদ্রূপ গ্রন্থস্বত্ব বিক্রি করাও বৈধ। নাজায়িয, হারাম বা নিদেনপক্ষে মাকরূহও নয়। যারা এ মত পোষণ করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন: মুস্তাফা আয-যারকা, ওয়াহাবা আল-যুহাইলী, ফাতহী আদ-দুরাইনী, মুহাম্মদ সাঈদ রমযান আল-বুতী, মুহাম্মদ উসমান শুবাইর, আলী আল-কুররাহ দাগী, আজীল আন-নাশমী, মুহাম্মদ রাওয়াশ কুলআহ, মুফতী তাকী উসমানী প্রমুখ।[২৮]

তারা তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণসমূহ নিম্নরূপ:

১. কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিপরীতে পারিশ্রমিক নেয়ার বৈধতার সঙ্গে কিয়াস করলে প্রমাণিত হয়, যে কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদান বা প্রসারের নিমিত্তে রচিত গ্রন্থ থেকে আর্থিক উপকারিতা গ্রহণ বৈধ। তাঁরা কুরআন শিক্ষা দানের পারিশ্রমিক গ্রহণের বৈধ হওয়ার প্রমাণস্বরূপ নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করেন:

إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله

"তোমরা যা কিছুর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নাও তার মধ্যে আল্লাহর কিতাব অগ্রগণ্য।"[২৯]

২. একজন কারিগর যেমন তার মেধা ও শ্রম দিয়ে কোন শিল্প বিনির্মাণ করলে তার বিনিময় গ্রহণ করেন, একজন গ্রন্থকারও তদ্রূপ নিজ মেধা-মনন দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করলে বিনিময় গ্রহণ তার জন্য বৈধ হবে- এটাই স্বাভাবিক।

وجمهور الفقهاء يرون - كما سيأتي البيان - أن الملك علاقة اختصاص مقرة من الشارع تنشأ بين المالك ومحل الملك. ومحل الملك أعم من أن يكون ماديًا أو غير مادي، فيصح - والحال هذه - أن نعتبر الحقوق المعنوية مالًا، فيكون الحق المعنوي من مشتملات المال، فيصح أن يكون محلًا مادامت علاقة الاختصاص قائمة وهو منتفع به شرعًا إذ الانتفاع من كل شيء حسب طبيعته، والناس يعتبرون فيه القيمة. فقد تكاملت له عناصر الملك.

দ্র. মাজাল্লাহ মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী : খ. ৫, পৃ. ১৮৭২

২৮. মুহাম্মদ আলী আল-যাগলূল ও হামদ ফাখরী আযযাম, "আল-হুকূক আল-মালিয়্যাহ লিল মুআল্লিফ: দিরাসাহ ফিকহিয়্যাহ মুকারানা", *আল-মাজাল্লা আল-উরদুনিয়্যাহ ফীদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ*, সংখ্যা ১, ২০০৫খ্রি.

২৯. আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, কিতাবুত তিব, হাদীস ৫৭৩৯

৩. বর্তমানে গ্রন্থস্বত্ব একটি উরফে পরিণত হয়েছে। উরফে শরীয়াহ বিরোধী কোন অনুষঙ্গ না থাকলে তা বৈধ।

৪. লেখক তার লিখনীর ব্যাপারে দুনিয়া ও আখিরাতে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। বইয়ে অন্তর্ভুক্ত যে কোন ধরনের ভুল তথ্যের ব্যাপারে তিনি দায়ী থাকেন। আল্লাহ বলেন: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾ "প্রত্যেক ছোট ও বড় বিষয় লিপিবদ্ধ রয়েছে।"[৩০] এটিই স্বাভাবিক নিয়ম যে, কোন লেনদেনের ঝুঁকি বহনকারী এ থেকে আগত লভ্যাংশের অধিকারী হন।[৩১]

৫. পূর্বসূরী অনেক আলিম তাঁদের রচিত অনেক গ্রন্থ বিক্রয় করেন। গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁদের যে কালি, কাগজ ব্যয় হয়েছে তার চেয়ে অত্যন্ত চড়া মূল্যে সেসব গ্রন্থ বিক্রি হয়েছে। যেমন আবূ নু'আইম তাঁর "হিলয়াতুল আওলিয়া" গ্রন্থটি চারশত দিনারে বিক্রি করেন; ইমাম ইবন হাজার আল-আসকালানী তাঁর একটি গ্রন্থ বিক্রি করেন তিনশত দিনারে। তাদের এ কার্যক্রম সমসাময়িক কোন আলিম বিরোধিতা করেছিলেন বলে জানা যায়নি। যা থেকে প্রমাণিত হয়, পূর্বসূরীরাও গ্রন্থস্বত্বের বিষয়টি স্বীকৃতি দিতেন।[৩২]

৬. উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, গ্রন্থস্বত্ব একটি বৈধ অধিকার ও সম্পদ। গ্রন্থকার, সঙ্কলক বা অনুবাদক গ্রন্থের স্বত্ব সংরক্ষণ করতে পারেন। ইচ্ছে করলে বিক্রি করতে পারেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ এ গ্রন্থ প্রকাশ ও বাজারজাতকরণের অধিকার রাখে না। এমনটি করা নাজায়িয ও হারাম হবে। অধিকন্তু, তা চুরি, ছিনতাই ও খেয়ানত বলে বিবেচিত হবে। কারণ, রাসূলে কারীম স. ইরশাদ করেন :

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

কোনো মুসলমানের সম্পত্তি তার পূর্ণ সম্মতি-সন্তুষ্টি ছাড়া নেওয়া হালাল হবে না।[৩৩]

৭. নিম্নের হাদীস থেকেও গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা বৈধ হওয়ার দলীল গ্রহণ করা যায় :

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ

---

৩০. আল-কুরআন, ৫৪ : ৫৩

৩১. এটি মূলত একটি ফিকহী কায়িদা (সূত্র) থেকে নিঃসরিত বিধান। কায়িদাটি হলো, الخراج بالضمان "ঝুঁকির ভিত্তিতে লাভ বণ্টিত হবে।" দ্র. ইবন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাজাঈর* (দামিশক: দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৪২০হি.), পৃ. ১৭৫

৩২. আবূ যায়েদ বকর ইবন আব্দুল্লাহ, *ফিকহুন নাওয়াযিল* (বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৪৩

৩৩. বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* হাদীস ১১৮৭৭

যে ব্যক্তি প্রথমে কোনো বস্তুর দিকে অগ্রসর হল, যার দিকে কোনো মুসলিম অগ্রসর হয়নি, তাহলে এটা তার।[৩৪]

অনাবাদি ভূমি দখল ও চাষাবাদ করলে মালিকানা ও স্বত্ব অর্জিত হওয়ার বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সকল ফকীহ এ বিষয়ে একমত। এর ওপর কিয়াস ও অনুমান করে গ্রন্থস্বত্ব এবং আবিষ্কারস্বত্বের বিষয়ে বিধান জানা সম্ভব। আমরা সংক্ষিপ্ততার প্রতি লক্ষ্য রেখে মাত্র একজন ফকীহের ভাষ্য উল্লেখ করছি। বিশিষ্ট হাম্বলী ফকীহ ইবনে কুদামাহ রহ. লিখেন :

ومن تحجر مواتا وشرع في إحيائه و لم يتم فهو أحق به لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : [من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به] رواه أبو داود فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به لأن صاحب الحق آثره به فإن مات انتقل إلى وارثه لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [من ترك حقا أو مالا فهو لوارثه] وإن باعه و لم يصح لأنه لم يملكه فلم يصح بيعه كحق الشفعة ويحتمل جواز بيعه لأنه صار أحق به.

যে ব্যক্তি অনাবাদি ভূমিতে চিহ্ন দিল এবং চাষাবাদ শুরু করল কিন্তু শেষ হয়নি; তবুও সে এ ভূমির মালিকানা অর্জনে অন্যের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। কেননা রাসূলে কারীম স. ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি প্রথমে কোনো বস্তুর দিকে অগ্রসর হল, যার দিকে কোনো মুসলমান অগ্রসর হয়নি, সে এর স্বত্বলাভে অগ্রাধিকার পাবে।" [ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।] এখন এ ব্যক্তি অন্য কাউকে এ ভূমি দিয়ে দিলে সেও অগ্রাধিকার পাবে। কারণ, স্বত্বাধিকারী নিজের ওপর তাকে প্রাধান্য দিয়েছে। স্বত্বলাভকারী মৃত্যুবরণ করলে তার ওয়ারিসগণ মালিক হবে। এ ক্ষেত্রে রাসূলে কারীম সা. বলেন: "কেউ কোনো স্বত্ব বা সম্পদ রেখে মারা গেলে তার ওয়ারিসগণ পাবে।" আর যদি এ ব্যক্তি ওই স্বত্ব বিক্রি করে দেয়, তাহলে তার বিক্রয় জায়িয হবে না। কারণ, সে এটার মালিক হয়নি। তাই তার বিক্রিও বিশুদ্ধ হবে না। যেমন শুফ'আর অধিকার বিক্রি করা নাজায়িয। তবে আরেকটি মতানুযায়ী তার এ বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, সে এ ভূমির মালিকানা লাভে অন্যের চেয়ে বেশি হকদার।[৩৫]

সুতরাং প্রতিভাত হল, গ্রন্থের লেখক বা অনুবাদক যেহেতু সকলের আগে কাজটি সম্পন্ন করেছে, তাই সে এর স্বত্বের মালিক। এ স্বত্ব নিজে সংরক্ষণ করতে পারবে, বিক্রি করাও বৈধ।

---

৩৪. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* হাদীস : ৩০৭৩, অধ্যায় : بَاب فِي إِقْطَاعِ الْأَرَضِينَ ; বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* হাদীস : ১২১২২

৩৫. মুওয়াফাকুদ্দীন ইবনে কুদামাহ, *আল-কাফী ফী ফিকহিল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৪৩

দুই: গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ বা বেচাকেনা সম্পর্কে নেতিবাচক অভিমত

অন্য একদল আলিমের মত, গ্রন্থস্বত্ব রাখা অবৈধ। লেখক, সঙ্কলক বা অনুবাদক– কেউই গ্রন্থের স্বত্ব রাখতে পারবে না। বইটি দ্বারা সকলেই সমভাবে উপকৃত হতে পারবে, যে কেউ ছাপিয়ে বাজারজাতও করতে পারে। যেহেতু গ্রন্থস্বত্ব রাখা অবৈধ, তাই গ্রন্থস্বত্ব বিক্রি করাও বৈধ নয়। এ দলের মধ্যে রয়েছেন, মুফতী মুহাম্মদ শফী, আহমদ হাজ্জী আল-কুরদী, তাকী উদ্দীন নাবহানী প্রমুখ।[৩৬]

তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে যেসব প্রমাণ উপস্থাপন করেন তার মধ্যে রয়েছে:

১. গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত হলে ইলম প্রকাশে ও বিতরণে বাধা দেওয়া বলে গণ্য হবে এবং তা ইলম গোপন করার শামিল। ইলম গোপন করা বৈধ নয়। শরীয়তের ইলম গোপন করার ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মহানবী স. বলেন:

من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار

> কেউ কোন ইলমের বিষয় জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তা গোপন করলে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিধান করানো হবে।[৩৭]

অতএব, গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ করা নাজায়িয এবং বিক্রির বিধানও অনুরূপ।

২. কোনো গ্রন্থ ক্রয়কারী সবধরনের উপকার হাসিলের অধিকার পায়। সে নিজের টাকা দিয়ে বইটি কিনে এনেছে। বইটিতে তার অধিকার অর্জিত হয়েছে। কাউকে হাদিয়াও দিতে পারে, বিক্রিও করতে পারে। তদ্রূপ বইটি ছাপিয়ে বাজারজাতও করতে পারবে।

৩. তাঁরা বলেন, গ্রন্থস্বত্ব একটি নিরেট স্বত্ব; কোনো দৃশ্যমান বস্তু নয়। মাল হওয়ার জন্যে দৃশ্যমান বস্তু হওয়া আবশ্যক।[৩৮]

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত

উপরে বর্ণিত উভয় পক্ষের মতামত ও দলীল-প্রমাণ আলোচনার পর আমরা মনে করি যে, প্রথম পক্ষের মতই অধিক যুক্তিযুক্ত ও তাদের উপস্থাপিত দলীল-প্রমাণ অধিকতর শক্তিশালী। কেননা, বিভিন্ন প্রকার সম্পদের মধ্যে মেধাসম্পদও এক ধরনের সম্পদ। একজন সৃজনশীল ব্যক্তি তার মেধা ব্যবহার করে এ সম্পদ অর্জন

---

৩৬. হুবাইলী, *আল-হুকুক আল-মুজাররাদা*, পৃ. ১৫১

৩৭. তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জায়া ফী কিতমানিল ইলম, হাদীস নং ২৬৪৯

৩৮. আবূ যায়েদ, *ফিকহুন নাওয়াযিল*, খ. ২, পৃ. ৯৭

করেন। অতএব, এর মালিকানা পাওয়ার অধিকার তারই। তাছাড়া যারা গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা অবৈধ মনে করেন তাদের উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণ দুর্বল। আমরা উপরে উল্লেখিত তাদের দলিলের প্রতিউত্তরে বলতে পারি:

১. গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত রাখলে ইলম গোপন করা হয় না। গ্রন্থকার নিজে তার গ্রন্থ প্রকাশ করছে অথবা কোনো প্রকাশনীকে প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছে। গ্রন্থস্বত্বের প্রশ্ন তো গ্রন্থ প্রকাশ করার সময়ের আসে। তাই ইলম গোপন করার অভিযোগ অযৌক্তিক। দুয়েক জনের কাছে ইলম পৌঁছে দিলেও দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কয়েকশ ছাত্র ভর্তি হওয়ার জন্যে পরীক্ষা দিলে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের ধারণক্ষমতা ও সক্ষমতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাত্রকে ভর্তির সুযোগ প্রদান করে। সবাইকে ভর্তি করে না। এখন কি এ কথা বলা যাবে যে, তারা ইলমকে গোপন রাখার গোনাহে লিপ্ত হল? কারণ, তারা সবাইকে ইলম শিক্ষা দেয়নি! তদ্রূপ এখানেও এ কথা বলা অবান্তর ও অযৌক্তিক।

২. এটি একটি যুক্তি মাত্র। যুক্তিটি অন্যায্য। বই কেনার দ্বারা সবরকমের অধিকার হাসিল হয় না। বাজার থেকে একটি বই কিনে এনে নিজের নামে ছাপিয়ে প্রকাশ করা কি জায়িয হবে? অন্যের বই নিজের নামে চালিয়ে দেওয়াও কি বৈধ? খেয়ানত হবে না? তাই যদি হয়, তাহলে বলুন, আমরা আমাদের টাকার মালিক। এখন এ টাকার মতো অনুরূপ টাকা ছাপিয়ে বাজারজাত করা কি বৈধ হবে? কখনোই বৈধ হতে পারে না। ঠিক তেমনি, বাজার থেকে একটি ব্রান্ড বা বিখ্যাত কোম্পানির কাপড় বা জুতা কিংবা অন্য জিনিস কিনে আনলেন। এখন কি ওই কোম্পানির লোগো নকল করে ওই পণ্য বানিয়ে বাজারজাত করতে পারবেন? বিষয়টি সম্পূর্ণ নাজায়িয। তদ্রূপ গ্রন্থ কিনে আনলেও তা ছাপিয়ে প্রকাশ করতে পারবে না, হারাম ও অবৈধ। কারণ, গ্রন্থটির স্বত্ব আরেকজনের। স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত তার স্বত্বে হস্তক্ষেপ করা অন্যায় ও খেয়ানত বলে বিবেচিত হবে।

৩. আমরা শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করেছি যে, মাল হওয়ার জন্যে দৃশ্যমান বস্তু হওয়া আবশ্যক নয়। তাই তাঁদের এ বক্তব্যও একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

উপসংহার

গ্রন্থস্বত্ব অন্যান্য সম্পদের মতো একটি সম্পদ। প্রত্যেক মালিক নিজের সম্পদ সংরক্ষণের অধিকার রাখে এবং ইচ্ছে হলে তা বিক্রিও করতে পারে। গ্রন্থস্বত্ব এবং অন্য নিরেট স্বত্বসমূহও মাল বলে বিবেচিত হয়। তাই গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ করা বৈধ এবং এর বেচাকেনাও জায়িয। অনুমতি ছাড়া কারো স্বত্বে হস্তক্ষেপ করা অন্যায় ও চুরি। সুতরাং কোনো লেখকের স্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত তার কোনো বই ছাপানো অথবা নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া নাজায়িয। হ্যাঁ, লেখক যদি পরিষ্কার বলে দেয় যে, আমার অমুক বই অথবা আমার সকল বই যে কেউ ছাপিয়ে প্রকাশ করতে পারে, তখন তা বৈধ হবে। লেখক অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো বই প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। এ বিষয়ে অনেকেই খেয়ানতের শিকার হচ্ছে। সর্বপ্রকার খেয়ানত থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭
জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬

ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রচলিত হায়ার পারচেজ : একটি শর'য়ী বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ রুহুল আমিন*

Hire Purchase Practices in Islamic Banking: A *Sharī'ah* Analysis

ABSTRACT

Hire Purchase is one of the investment methods on which Islamic Banks are specifically dependent upon. The names and terms associated with the concept differ according to the country location or type of bank, but the concept of the method remains. On basis of nature of applying method and fame the paper presents a brief discussion about three methods, namely al-Ijarah bil bay tahta shirkatil milk (HPSM), al-Ijarah al-Muntahiyyah bit tamleek (IMBT) and al-Ijarah thumma al-Bay (AITAB). The article specifically aims to discuss Sharī'ah issues related to Hire Purchase practices under Shirkatil Milk practiced in Bangladesh through introduction and discussion of the pertinent Sharī'ah basis, application and application methods in Islamic Banks of Bangladesh, pertinent Sharī'ah issues etc. The Article has been prepared following descriptive and practical approaches. The research proves that application of discussed methods specifically the method practiced in Bangladesh according to Sharī'ah is possible and the income from this mode of investment can be lawful if it is exercised as per the instructions of Sharī'ah. However, it is important to note that one has to be careful regarding violations of the Sharī'ah in case of applying this product.

Keywords: Ijārah; Islamic Banking; Shirkatul Milk; HPSM; IMBT; AITAB; Buy; Contract

---

* পিএইচডি গবেষক, ফিক্হ ও উসূল আল-ফিক্হ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া।

সারসংক্ষেপ

ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিশেষভাবে যেসব বিনিয়োগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে 'হায়ার পারচেজ' বা ভাড়ান্তে ক্রয় তার অন্যতম। দেশ ও ব্যাংক ভেদে এ পদ্ধতিটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। অত্র প্রবন্ধে প্রয়োগ পদ্ধতির ধরন ও প্রসিদ্ধির বিচারে 'আল-ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' (HPSM), 'আল-ইজারা আল-মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক' (IMBT) ও 'আল-ইজারা ছুম্মা আল-বাই" (AITAB) এ তিনটি পরিভাষার সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষত বাংলাদেশে প্রচলিত 'আল-ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' (الإجارة بالبيع تحت شركة الملك) বা Hire Purchase under Shirkatil Milk সংশ্লিষ্ট শরী'আহ অনুষঙ্গসমূহ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ প্রবন্ধে প্রডাক্টটির পরিচিতি, শর'য়ী ভিত্তি, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে এর প্রয়োগ ও প্রয়োগ পদ্ধতি, শরী'আহ অনুষঙ্গ ইত্যাদি আলোচনা বিধৃত হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক ও প্রায়োগিক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, আলোচিত হায়ার পারচেজের পদ্ধতিসমূহ, বিশেষত বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুসৃত পদ্ধতিটি শরী'আহসম্মত উপায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব এবং যথাযথ শরী'আহ পরিপালন করে এর প্রয়োগ করা হলে তা থেকে অর্জিত লভ্যাংশ সম্পূর্ণ হালাল। তবে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন জরুরী, যাতে কোনভাবেই শরী'আহ লঙ্ঘিত না হয়।

মূলশব্দ: ইজারা; ইসলামী ব্যাকিং; শিরকাতুল মিলক; HPSM; IMBT; AITAB; বাই'; চুক্তি।

ভূমিকা

ইজারা বা ভাড়ায় চুক্তি একটি প্রাচীন পদ্ধতি। এর সূচনা নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মতবিরোধ থেকে স্পষ্ট হয়, ব্যবিলন বা রোমান সভ্যতায় এর উৎপত্তি।[১] ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং শরী'আতে তার অনুমোদন দেয়া হয়। ফকীহগণ তাঁদের প্রণীত গ্রন্থসমূহে তাঁদের সময়কালে প্রচলিত ইজারার বিভিন্ন স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন। ভাড়াভিত্তিক বিক্রয় চুক্তির এ আধুনিক ধরনটির সূচনা হয় ইংল্যান্ডে। ১৮৪৬ খ্রি. এক বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা গ্রাহকদেরকে আকর্ষণ করা ও তাদের জন্য বাদ্যযন্ত্র সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে এ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। অল্প দিনেই তার উদ্ভাবিত পদ্ধতি জনপ্রিয়তা পায় ও ব্যাপক প্রসারিত হয়।[২] পরবর্তীতে আমেরিকায় ১৯৫২ সালে এ পদ্ধতির ভিত্তিতে লেনদেনের জন্য United States

---

১. আহমদ আব্দুল লতিফ আদ-দাওসেরী, "আল-বু'দ আত-তানমী লিল ইজারাহ" *ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা* শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণাপত্র; কুয়েত, ৫ ও ৬ মে, ২০০১খ্রি., পৃ. ৩

২. আবূ লাইল ইবরাহীম দাসূকী, *আল-বাই' বিত তাকসীত ওয়াল বুয়ূ আল-ইতিমানিয়্যাহ আল-উখরা* (কুয়েত: কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৪হি./ ১৯৮৪খ্রি.), পৃ. ৩০৪

Leasing Corporation নামে পৃথক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় Mercantile Credit Company এবং ফ্রান্সে ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Locafance কোম্পানি। পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ধারণা সম্প্রসারণ লাভ করে ও এ পদ্ধতিতে লেনদেনের জন্য বিভিন্ন কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।[৩]

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ পদ্ধতিকে শরী'আহ অভিযোজনের (Shariah Adaptation) মাধ্যমে প্রয়োগ করে থাকে। প্রায়োগিক দিক দিয়ে এ পদ্ধতি ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের একটি বিরাট অংশ দখল করে আছে। একদিকে অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এ জাতীয় বিনিয়োগের প্রতি আলাদা আকর্ষণ থাকে, অন্যদিকে গ্রাহক পণ্যটি নিজের মালিকানা পাওয়ার আশায় এর পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করে থাকেন। অতএব, বিনিয়োগের এ পদ্ধতিটির গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর লেনদেনে শরী'আহ পরিপালন ও সব ধরনের সুদী ও শরী'আহ বিবর্জিত কারবার পরিত্যাগ করে বিধায় এ পদ্ধতিটির প্রয়োগেও যথাযথ শরী'আহ নীতিমালা অনুসরণ করে থাকে। ফলে এসব পদ্ধতির প্রয়োগের সাথে বিভিন্ন শরী'আহ অনুষঙ্গ জড়িত রয়েছে। অত্র প্রবন্ধে উক্ত অনুষঙ্গসমূহের বর্ণনা তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

মালিকানা প্রদানের শর্তযুক্ত ভাড়া চুক্তি

ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের বিস্তৃতির স্বার্থে যেসব প্রডাক্ট উদ্ভাবন করা হয়েছে তার অন্যতম হলো, গ্রাহককে মালিকানা প্রদান বা তার কাছে বিক্রয়ের শর্তে কোন সম্পদ ভাড়া দেয়া। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও ব্যাংক ভেদে এ পদ্ধতিটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- আল-ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক[৪] (الإجارة بالبيع تحت شركة الملك) বা মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিক্রয়ের শর্তে ভাড়া, 'আল-ইজারা আল-মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক' (الإجارة المنتهية بالتمليك) বা মালিকানায় পরিসমাপ্ত ভাড়া, আল-ইজারা বি-শরতিত তামলীক (الإجارة بشرط التمليك) বা মালিকানার শর্তে ভাড়া, ইজারাহ মা'আল ইকতিনা' (الإجارة مع الاقتناء) বা মালিকানা অর্জনের শর্তে ভাড়া, আল-ইজারা ছুম্মা আল-বাই' (الإجارة ثم البيع) বা ভাড়া অতঃপর বিক্রয়, আল-ইজার (الإيجار) বা ভাড়ায় প্রদান, আল-ইজার আল-মুনতাহী বিত তামলীক (الإيجار المنتهي بالتمليك) বা মালিকানায় সমাপ্ত ভাড়া, আল-ইজার আল্লাজি

---

৩. আদ-দাওসারী, "আল-বু'দ আত-তানমী লিল ইজারাহ", পৃ. ৩।

৪. ফিকহের গ্রন্থসমূহে 'শিরকাতুল মিলক' পরিভাষাটি 'শারিকাতুল মিল্‌ক' (شَرِكَةُ الْمِلْكِ) রূপে ব্যবহৃত হয়। তবে 'শিরকাতুল মিলক' পরিভাষাটিও শুদ্ধ এবং ইসলামী ব্যাংকিং এর জগতে প্রচলিত বিধায় প্রবন্ধে পরিভাষাটি এভাবেই উলেম্নখ করা হয়েছে।

ইয়ানতাহী বিত তামলীক (الإيجار الذي ينتهي بالتمليك) বা যে ভাড়া মালিকানায় সমাপ্ত হয়, আত-তাজীর আল-মুনতাহী বিত তামলীক (التأجير المنتهي بالتمليك) বা মালিকানায় সমাপ্ত হওয়া ভাড়াচুক্তি, তাজীর মা'আল মু'আয়াদা বিত তামলীক (التأجير مع المواعدة بالتمليك) বা মালিকানা প্রদানের ওয়াদা সম্বলিত ভাড়া, আল-ইজার আস-সাতির লিলবাই' (الإيجار الساتر للبيع) বা ভাড়ার অন্তরালে বিক্রয়, আল-বাই' আল-ইজারী (البيع الإيجاري) বা ভাড়াভিত্তিক বিক্রয় ইত্যাদি।

দেশ, অঞ্চল ও ব্যাংক ভেদে এ প্রডাক্টটির নাম ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রয়োগপদ্ধতির ধরন একই বা ক্ষেত্রবিশেষে যৎসামান্য ভিন্নতা রয়েছে। পরিভাষাগুলো থেকে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রয়োগ পদ্ধতির ধরন বিবেচনায় নিম্নোক্ত তিনটি পরিভাষাকে নির্বাচন করা যায়:

১. আল-ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক (الإجارة بالبيع تحت شركة الملك)
২. আল-ইজারা আল-মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক (الإجارة المنتهية بالتمليك)
৩. আল-ইজারা ছুম্মা আল-বাই' (الإجارة ثم البيع)

এসব পরিভাষা সমসাময়িক হওয়ায় এ সম্পর্কে পূর্বসূরী ফকীহগণের কোন মতামত পাওয়া যায় না। তবে সমসাময়িক ফকীহ ও আলিমগণ এগুলোর সংজ্ঞা ও ধরন বর্ণনার প্রয়াস নিয়েছেন। যেমন-

মুহীউদ্দীন আল-কুররা দাগী বলেন:

> اتفاق إيجار يلتزم فيها المستأجر بشراء الشيء المؤجر في الوقت المتفق عليه خلال مدة الإيجار أو بعدها بسعر يتفق عليه مسبقا أو فيما بعد.
>
> এমন ভাড়া চুক্তি, যাতে ভাড়াগ্রহীতা ভাড়াপ্রদত্ত সম্পদ ভাড়ার মেয়াদের মধ্যে বা মেয়াদ শেষে দু পক্ষের সম্মতিতে পূর্ব থেকে ঐকমত্য হওয়া সময়ে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য থাকেন, চাই এ মূল্য আগেভাগে নির্ধারণ করা হোক কিংবা পরে নির্ধারণ করা হোক।[৫]

কালআহ জী বলেন:

> هي عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما للآخر شيئا بمبلغ معين من المال لمدة معينة، بشرط أو تؤول ملكية هذا الشيء إلى المستأجر في نهاية المدة المتفق عليها.
>
> একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যাতে একপক্ষ অন্যপক্ষকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নির্ধারিত সময়ের জন্য কোন কিছু ভাড়া দেন এই শর্তে যে, উক্ত জিনিসের

---

৫. আলী মুহী উদ্দীন আল-কুররা দাগী, "আল-ইজারাহ ওয়া তাতবীকাতুহাল মুআসিরাহ (আল-ইজারাহ আল-মুনতাহিয়্যাহ বিত তামলীক): দিরাসাহ ফিকহিয়্যাহ মুকারানাহ", *ওআইসি অধিভুক্ত ইসলামী ফিকহ একাডেমির ১২তম অধিবেশনে* উপস্থাপিত গবেষণাপত্র, রিয়াদ, ২৩-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০০খ্রি., পৃ. ৪৯

মালিকানা দু'পক্ষের সম্মতিতে নির্ধারিত ভাড়ার মেয়াদান্তে ভাড়া গ্রহণকারীর কাছে স্থানান্তরিত করা হবে।[৬]

এদুটি সামগ্রিকভাবে হায়ার পারচেজ-এর সংজ্ঞা। এক্ষেত্রে কোন একটি সংজ্ঞাকে প্রাধান্য না দিয়ে অত্র গবেষণার জন্য নির্বাচিত তিনটি পরিভাষার পরিচিতি প্রদানের সময় প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে উপর্যুক্ত তিনটি পরিভাষার পরিচিতি, স্বরূপ ও কর্মকৌশল আলোচন করা হলো:

আল-ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক (الإجارة بالبيع تحت شركة الملك)

'ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে প্রচলিত একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক যৌথভাবে কোন সম্পদের মালিকানা অর্জন করে। অতঃপর ব্যাংক উক্ত সম্পদে তার মালিকানাধীন অংশটুকু গ্রাহকের কাছে ভাড়া প্রদান ও নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে বিক্রয় করার চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এর কর্মকৌশল নিম্নরূপ:
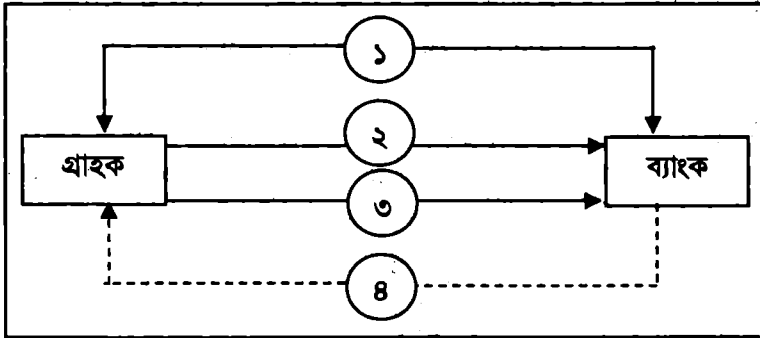
ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক এর কর্মকৌশল ও তার প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

১. প্রথমে গ্রাহক ও ব্যাংক কোন সম্পদের মালিকানায় অংশীদারিত্বের চুক্তিতে সম্মত হন।

২. গ্রাহক কর্তৃক সম্পদে ব্যাংকের অংশ ভাড়া গ্রহণের চুক্তিতে আবদ্ধ হন ও নির্দিষ্ট হারে ভাড়া প্রদান করেন।

---

৬. মুহাম্মদ রাওয়াস কালআহ জী, *আল-মুআমালাতুল মালিয়্যাহ আল-মুআসিরাহ ফী দুইল ফিকহি ওয়াশ শারীআহ* (বৈরূত: দারুন নাফাঈস, ১৪২০হি./১৯৯১খ্রি.), পৃ. ৮৬

৭. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি: শরী'আহর নীতিমালা*, সম্পাদনা: প্র. ড. আবু বকর রফিক (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০১১খ্রি.), পৃ. ৯৩ এ উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষকের নিজস্ব চিত্রায়ন।

৩. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি: সম্পদে ব্যাংকের অংশ গ্রাহক ক্রয় করার চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়।
৪. ব্যাংকের অংশের মালিকানা গ্রাহকের কাছে স্থানান্তরিত হয় এবং গ্রাহক সম্পদের পূর্ণ মালিক হন।

অতএব বলা যায়, 'ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' এমন এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যাতে যৌথ মালিকানাধীন কোন সম্পদের একপক্ষ তার অংশটুকু নির্ধারিত মেয়াদের জন্য অন্য পক্ষের কাছে ভাড়া দেন এবং নির্ধারিত কিস্তিতে ঐ অংশের মূল্য পরিশোধের শর্তে তা বিক্রি করেন। সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধিত হয়ে গেলে চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পর সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা ভাড়াগ্রহীতার কাছে হস্তান্তরিত হয়।

আল-ইজারা আল-মুনতাহিয়া বিত তামলীক (الإجارة المنتهية بالتمليك)

ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলীক বা 'মালিকানা প্রদানের মাধ্যমে পরিসমাপ্ত ভাড়া' পদ্ধতিটি মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক রিয়েল এস্টেটসহ অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কোন সম্পদ এককভাবে ক্রয় করে বিনিয়োগ গ্রহীতার কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া প্রদান করে এবং গ্রাহক বিভিন্ন কিস্তিতে ভাড়া পরিশোধ করেন। মেয়াদ শেষে ব্যাংক সম্পদের মালিকানা ভাড়াটিয়ার কাছে হস্তান্তর করে। ভাড়াটিয়া বা বিনিয়োগ গ্রাহককে সম্পদের মালিক বানানোর মাধ্যমে এ চুক্তির সমাপ্তি হয়। এর প্রয়োগকৌশল নিম্নরূপ:
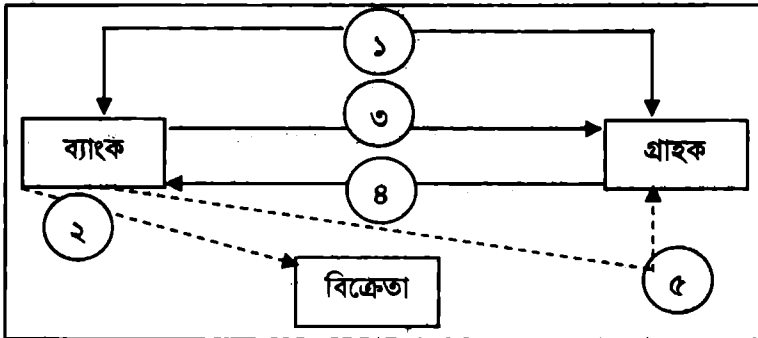
চিত্র ২: ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলীক এর প্রয়োগকৌশল[৮]

৮. চিত্রটি আল-বারাকা ব্যাংকিং গ্রুপের চর্চিত ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলীক পদ্ধতির আলোকে গবেষকের চিত্রায়ন। তাদের চর্চিত পদ্ধতির বিষয়ে দ্র. www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&ID=50, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ১২ আগস্ট, ২০১৬

চিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়:

১. গ্রাহক ব্যাংকের কাছে সম্পদ ক্রয়ের শর্তে ভাড়া গ্রহণের তথা 'ইজারা মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক'-এর ভিত্তিতে বিনিয়োগ পাওয়ার আবেদন করেন।

২. ব্যাংক গ্রাহকের আবেদন বিবেচনা করলে প্রার্থিত সম্পদ তার মূল মালিক থেকে এককভাবে ক্রয় করে।

৩. ব্যাংক উক্ত সম্পদটি গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া প্রদান করেন।

৪. গ্রাহক ব্যাংককে নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করেন।

৫. মেয়াদ শেষে ব্যাংক উক্ত সম্পদের মালিকানা গ্রাহক বরাবর হস্তান্তর করে।

অতএব বলা যায়, "ইজারা মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক এমন এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যাতে একপক্ষ অন্যপক্ষের অনুরোধের ভিত্তিতে কোন সম্পদ ক্রয় করে ভাড়া প্রদান করেন এবং ভাড়া চুক্তির মেয়াদ শেষে ও সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধের পর ভাড়াটিয়াকে উক্ত সম্পদের মালিকানা প্রদান করা হয়।"

আল-ইজারা ছুম্মা আল-বাই' (الإجارة ثم البيع)

আল-ইজারা ছুম্মা আল-বাই' (Al-Ijarah Thumma Al-Bai□) এর সংক্ষিপ্তরূপ AITAB পরিভাষাটি মালয়েশিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এ পদ্ধতিটির ধরন এমন যে, একই নথিতে 'ভাড়া' ও 'ক্রয়-বিক্রয়' এর পৃথক দুটি চুক্তি সংযুক্ত থাকে। প্রথমে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পদের ভাড়া চুক্তি কার্যকর করা হয়। নির্ধারিত মেয়াদে কিস্তিসমূহ পরিশোধান্তে ব্যাংক গ্রাহক তথা ভাড়াটিয়াকে উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত মূল্যে উক্ত সম্পদটি কিনে নেয়ার এখতিয়ার প্রদান করেন। গ্রাহক উক্ত সম্পদ ক্রয় করতে চাইলে 'ক্রয়-বিক্রয়' চুক্তি কার্যকর হয়।[১] নিম্নের চিত্রে এ পদ্ধতির প্রয়োগকৌশল বর্ণিত হয়েছে:

---

১. Seif I. El-Din & N. Irwani Abdullah, "Issue of Implementing Islamic Hire Purchase in Dual Banking Systems: Malaysia's Experience", *Thunderbird International Business Review*, Special Issue: Islamic Finance: A System at the Crossroads? Volume 49, Issue 2, March/April 2007, p. 225–249.
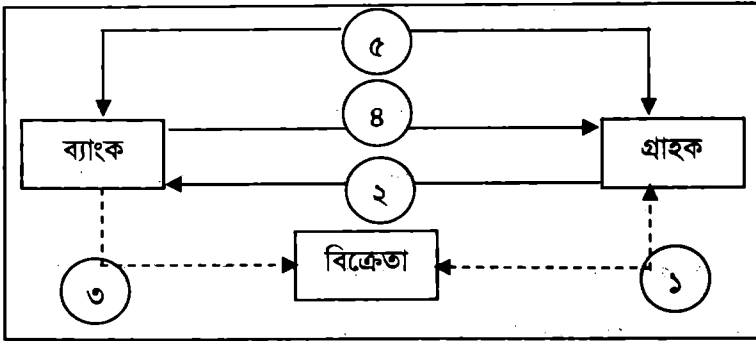
চিত্র ৩: মালয়েশিয়ায় চর্চিত আল-ইজারা ছুম্মা আল-বাই' এর কর্মপ্রক্রিয়া[১০]

চিত্রটির বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

১. গ্রাহক ডাউন পেমেন্ট প্রদানের মাধ্যমে মূল মালিক থেকে কাঙ্ক্ষিত সম্পদ ক্রয় করেন।

২. গ্রাহক ইজারা ছুম্মা বাই' পদ্ধতির ভিত্তিতে অর্থায়নের জন্য ব্যাংক বরাবর আবেদন করেন। ব্যাংক তার আবেদন বিবেচনায় নিয়ে এলে উক্ত সম্পদ গ্রাহক থেকে কিনে নেয়।

৩. ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে সম্পদের অবশিষ্ট মূল্য মূল বিক্রেতাকে পরিশোধ করে।

৪. ব্যাংক সম্পদটি 'ইজারা ছুম্মা বাই' চুক্তির ভিত্তিতে গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদে ভাড়া দেয় এবং গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করেন।

৫. গ্রাহককে প্রদত্ত উক্ত সম্পদ কিনে নেয়ার এখতিয়ারের ভিত্তিতে মেয়াদ শেষে ব্যাংক নামমাত্র মূল্যে সম্পদটি গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে।[১১]

অতএব, "ইজারা ছুম্মা বাই' এমন ভাড়া চুক্তি যার মেয়াদ শেষে ও কিস্তি পরিশোধের পর ভাড়াটিয়াকে ভাড়া দেয়া সম্পদটি ক্রয়ের এখতিয়ার দেয়া হয়।"

---

১০. সূত্র: Bank Islam, *Application of Shariah Contacts in Islamic Banking Products and Services* (Kuala Lumpur: Bank Islam Malaysia Berdad, 2013), p. 67.

১১. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহক থেকে সম্পদটি ক্রয় করে আবার তার কাছে বিক্রি করে, যা দৃশ্যত বাই'উল 'ঈনা। তবে এটি বাই'উল 'ঈনা নয় এ কারণে যে, ক্রয়মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। অর্থাৎ ব্যাংক উক্ত সম্পদ থেকে পৃথকভাবে কোন মুনাফা অর্জন করে না, বরং ভাড়া গ্রহণ করে। এছাড়াও এ পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক শরী'আহ অনুষঙ্গ রয়েছে। যেহেতু অত্র প্রবন্ধটি 'ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' কেন্দ্রীক সেহেতু সেগুলোর আলোচনা উল্লেখ করা হলো না।

মালিকানা প্রদানের শর্তযুক্ত ভাড়া চুক্তিতে মালিকানা হস্তান্তর প্রক্রিয়া
মালিকানা প্রদানের শর্তযুক্ত ভাড়া চুক্তির উপরিউক্ত তিনটি প্রসিদ্ধ পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্পদের মালিকানা গ্রাহক বরাবর হস্তান্তর করা হয়। যেমন-

১. ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, HPSM তথা ইজারা বিল বাই‘ তাহতা শিরকাতিল মিলক পদ্ধতিতে ব্যাংক সম্পদে তার নির্ধারিত অংশটি গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেয় এবং একই সাথে তার কাছে বিক্রি করে। এ পদ্ধতিতে চুক্তি অনুসারে ব্যাংক বিক্রির সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে সম্পদের মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করে। এর প্রক্রিয়াটি এমন যে, সম্পদে ব্যাংকের মালিকানাধীন অংশের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা বিভিন্ন কিস্তিতে ভাগ করা হয়। কিস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় সমন্বয় করা হয়, গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের অংশ ব্যবহারের ভাড়া ও ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের অংশ কিনে নেয়ার ক্রয়মূল্য। প্রতিটি কিস্তি পরিশোধের সাথে সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক ক্রয়সূত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পদে কিস্তির সমপরিমাণ অংশের মালিক হন। এভাবে ক্রমান্বয়ে সকল কিস্তি পরিশোধ করা হলে গ্রাহক সম্পদটির সম্পূর্ণ মালিকানা লাভ করেন।[১২]

২. ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলীকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মালিকানা হস্তান্তর করা হয়। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াসমূহ উলেস্নখ করা হলো:

ক. হিবা: এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক তার মালিকানাধীন সম্পদটি গ্রাহকের কাছে এ মর্মে ভাড়া প্রদানের চুক্তি করবে যে, গ্রাহক সম্পূর্ণ ভাড়া পরিশোধ করলে সম্পদটি তাকে হেবা (هبة/দান) করা হবে। অতঃপর সম্পূর্ণ ভাড়া পরিশোধ করলে একটি পৃথক হেবা চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদের মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে ভাড়া চুক্তিতে যদি উল্লেখ করা হয় যে, সম্পূর্ণ ভাড়া পরিশোধের পর সম্পদের মালিকানা হেবার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের বরাবর হস্তান্ত রিত হবে, তাহলে পৃথক হেবা চুক্তির প্রয়োজন হয় না।

খ. নামমাত্র (টোকেন) মূল্য: এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক তার মালিকানাধীন সম্পদটি গ্রাহকের কাছে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ভাড়া প্রদান করে। মেয়াদ শেষে নামমাত্র মূল্যে (Token/رمزي) একটি স্বতন্ত্র বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে গ্রাহকের কাছে সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর করে।

গ. ভাড়াচুক্তি শেষে নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধ: এ প্রক্রিয়াটি উপরের প্রক্রিয়ার মতই। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, বিক্রয় মূল্যটি নামমাত্র হবে না, বরং উভয়ের সম্মতিক্রমে পূর্ব নির্ধারিত হবে।

---

১২. শামসুল হুদা ও শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি*, পৃ. ৯৮

ঘ. চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধ: এ প্রক্রিয়ায় ভাড়া চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যে কোন সময় গ্রাহক নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করলে সম্পদের মালিকানা তার কাছে হস্তান্তর করা হয়।[১৩]

৩. ইজারা ছুম্মা বাই' পদ্ধতিতে ব্যাংক ভাড়া চুক্তি শেষে নামমাত্র মূল্যে সম্পদের মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করে। এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য একটি পৃথক বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়।[১৪]

উপরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুশীলিত হায়ার পারচেজ-এর তিনটি প্রসিদ্ধ পদ্ধতির পরিচিতি ও কর্মকৌশল আলোচনা করা হয়েছে। প্রায়োগিক দিক থেকে এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য বিদ্যমান। একইভাবে শরী'আহ অভিযোজনের (Shariah Adaptation) ক্ষেত্রেও রয়েছে ভিন্নতা। স্বভাবতই এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট শরী'আহ অনুষঙ্গসমূহও ভিন্ন ভিন্ন। পরিসরের সংক্ষিপ্ততার দিকে দৃষ্টি দিয়ে অত্র গবেষণা কর্মে শুধুমাত্র বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে প্রচলিত 'ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' পদ্ধতিটির বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক এর প্রয়োগ

'ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সর্বাধিক অনুশীলিত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহের একটি। শিল্প, পরিবহণ, আবাসন, গৃহায়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME), নারী উদ্যোক্তার অর্থায়নসহ বিভিন্ন খাতে এ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ, পরিবহণ খাতে বাস, ট্রাক, জাহাজ ইত্যাদি, আবাসন ও গৃহায়ন খাতে গৃহ নির্মাণ বা এপার্টমেন্ট ক্রয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের স্থায়ী সম্পদ (Fixed Asset) সব খাতেই বিনিয়োগের অভিন্ন নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। সে অনুযায়ী ব্যাংক ও গ্রাহক মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোন সম্পদ ক্রয় করে। অতঃপর ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশ গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া দেয় এবং একই সঙ্গে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রমান্বয়ে বিক্রি করার চুক্তি করে। প্রতিটি কিস্তি প্রদানের মধ্য দিয়ে সম্পদে ব্যাংকের অংশ ও ভাড়ার পরিমাণ কমতে থাকে এবং গ্রাহকের অংশ বাড়তে থাকে।

---

১৩. দ্র. www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&ID=50, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ১২ আগস্ট, ২০১৬

১৪. Bank Islam, *Application of Shariah Contacts*, p. 67

ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক পদ্ধতিটি 'ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা' (المشاركة المتناقصة/ Diminishing Musharaka) এর মত দৃশ্যমান হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা মুশারাকা মুতানাক্বিসাহ বা ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা একটি অংশীদারী ব্যবসা। এ পদ্ধতিতে অর্থায়নকৃত প্রকল্পের লাভ-লোকসান গ্রাহক ও ব্যাংক নির্ধারিত হারে বহন করে। ব্যবসায় লাভ হলে অংশীদারগণ সকলেই লাভবান হন, পক্ষান্তরে লোকসান হলে প্রত্যেক পক্ষ মূলধনে তার অংশের অনুপাতে ক্ষতি বহন করেন। পক্ষান্তরে ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক পদ্ধতিটি কোন ব্যবসা নয় বা এখানে লাভ লোকসানের কোন প্রশ্ন নেই। কেননা যৌথ মালিকানায় অর্জিত সম্পদটির ব্যাংকের অংশ গ্রাহককে ভাড়া দেয়া হয়, সাথে সাথে তা বিক্রিও করা হয়। বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্যের অতিরিক্ত কোন মুনাফা ধার্য করা হয় না। তবে ক্রয় মূল্যের সাথে নির্বাহী খরচও যোগ করা হয়। অতএব, এ পদ্ধটি ইজারা, শিরকাতুল মিলক ও বাই' এ তিন চুক্তির সমাহার হলেও এখানে ইজারা চুক্তিই মুখ্য হিসেবে বিবেচ্য হয়।

বাংলাদেশের প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। বাংলাদেশে মোট ৮টি ব্যাংক পূর্ণ মাত্রায় ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা করছে। নিচের সারণিতে ২০১৫ সালে ব্যাংকসমূহে ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক পদ্ধতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

ক্রম	ব্যাংক	HPSM বিনিয়োগ	মোট বিনিয়োগ
০১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১১৭৩২৬.৬২	৪৯৩৭৮৯.৩০
০২	আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৩৮৩৩৯.৩০	১৬১৫০৬.২৬
০৩	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৮৬৮৫.৮৫	১৩৪১১৬.৮৫
০৪	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৭১১৭.৩৪	৯৬৮৩৪.৬৫
০৫	ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২১১৮৩.৮৩	১৮৭৬৮০.০০
০৬	এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিঃ	৮২৪৪০.৮২	১৯৬৩১১.৪২
০৭	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৩৪৭৩.৪৫	৯১৮৮.৫১
০৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	১৯০৪.০২	৪৫৫৯২.৮৬

সারণি ১: বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে ২০১৫ সালে HPSM পদ্ধতিতে বিনিয়োগ (মিলিয়ন টাকায়)[১৫]

১৫. এ পরিসংখ্যান ব্যাংকসমূহের ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে গৃহীত।

উপরোক্ত সারণি থেকে প্রাপ্ত তথ্য তথা ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক পদ্ধতিতে কৃত বিনিয়োগ ও ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ বিশ্লেষণ করলে এর যে শতকরা হার নির্গত হয় তা নিম্নের দ-চিত্রে বর্ণিত হয়েছে।
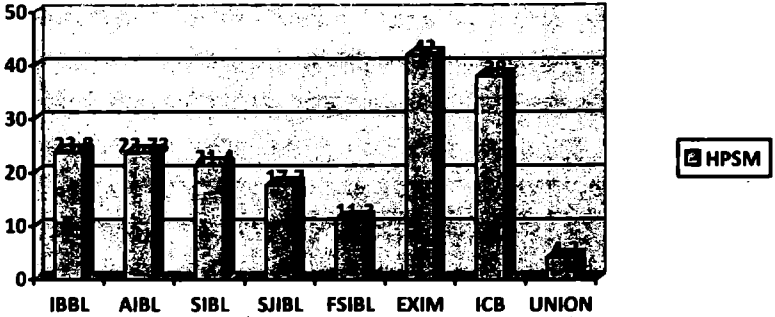
চিত্র ৪: ২০১৫ সালে ইসলামী ব্যাংকসমূহে HPSM পদ্ধতিতে বিনিয়োগের শতকরা হার[১৬]

উপরের দ-চিত্র থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এক্সিম ব্যাংক অগ্রগামী। ব্যাংকটি তার মোট বিনিয়োগের ৪২% এ পদ্ধতিতে প্রদান করেছে। মোট বিনিয়োগের ৩৮% ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক পদ্ধতিতে প্রদান করে আইসিবি ইসলামী ব্যাংক এক্ষেত্রে ২য় অবস্থানে রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ও আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কাছাকাছি অবস্থানে থেকে এ প্রডাক্টটির প্রয়োগ করেছে। তাদের বিনিয়োগের শতকারা হার যথাক্রমে ২৩.৮% ও ২৩.৭৩%। বাকি ব্যাংকগুলোর মধ্যে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক উক্ত দুই ব্যাংকের নিকটতম অবস্থানে রয়েছে। এ পদ্ধতিতে এর বিনিয়োগ হার ২১.৪%। এরপর এ পদ্ধতিতে ১৭.৭% বিনিয়োগ করেছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক। ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক করেছে তাদের মোট বিনিয়োগের ১১.৩%। এ পদ্ধতিতে সবচেয়ে কম বিনিয়োগ করেছে ইউনিয়ন ব্যাংক। যার পরিমাণ ৪.২%। অতএব, এ সার্বিক চিত্র থেকে স্পষ্ট

---

১৬. এ দ-চিত্রটি সারণিতে উলেস্নখিত ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতুল মিলক পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ও মোট বিনিয়োগের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত। ব্যাংকসমূহের পূর্ণরূপ: IBBL= ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, AIBL= আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, SIBL= সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, SJIBL= শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, FSIBL= ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, EXIM= এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড, ICB= আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, UNION= ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড।

হচ্ছে যে, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরের মোট বিনিয়োগের প্রায় একচতুর্থাংশ (২২.৮%) এ পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়।

ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক সংশ্লিষ্ট শর'য়ী অনুষঙ্গসমূহ

ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী অনুষঙ্গসমূহ নিম্নরূপ:[১৭]

১. শর'য়ী ভিত্তি

ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক (إجارة بالبيع تحت شركة الملك) একটি আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতি হওয়ায় ফিকহের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এর শরয়ী বিধান পাওয়া যায় না। তবে এ পদ্ধতিটি যে তিনটি চুক্তির সমন্বয়ে উদ্ভাবিত তথা ইজারা (إجارة), বাই' (البيع) ও শিরকাতুল মিলক (شركة الملك) সেগুলোর বিস্তারিত বিধান ফিকহের গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। অতএব, ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক এর ভিত্তিমূল হিসেবে এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা উপস্থাপন আবশ্যক।

ক. ইজারা: ইজারা (إجارة) শব্দটি اجر থেকে নির্গত একটি মাসদার সিমায়ী (مصدر سماعي) বা শ্রুতিমূলক ক্রিয়ামূল। ইবনুল ফারিস [মৃ. ১০০৪খ্রি.] বলেন, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর দুটি অর্থ রয়েছে: কোন কিছুর বিপরীতে প্রদেয় বিনিময় এবং হাড় জোড়া লাগানো (جبر العظم)।[১৮] তবে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি 'ভাড়া চুক্তি' বুঝাতে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। পরিভাষায় ইজারা একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যাতে একপক্ষ অন্যপক্ষকে কোনো বস্তুর উপকারিতা বা সুবিধা (utility, advantage) ভাড়ার বিনিময়ে বিক্রি করেন। ফকীহগণ ইজারার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সংজ্ঞা হলো:

> عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معلومة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل بعوض معلوم
>
> নির্দিষ্ট বা বিশেষিত সম্পদ অথবা শ্রম থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্ধারিত বিনিময় সাপেক্ষে জ্ঞাত বৈধ উপকার ভোগের চুক্তি।[১৯]

---

১৭. ফিকহী গবেষণার নীতিমালা অনুযায়ী শরী'আহ বিষয়ক, বিশেষত মতবিরোধপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন, তার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা, অতঃপর অগ্রাধিকার প্রদানের নীতিমালার ভিত্তিতে কোন একটি মতকে অগ্রাধিকার দেয়া বাঞ্ছনীয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের পরিসর সংক্ষিপ্ত হওয়ায় শরী'আহ অনুষঙ্গসমূহের সবিস্তর আলোচনা সম্ভব হয়নি। তবে কোন মতকে অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে যথার্থ গবেষণা ও নীতিমালা অনুসরণ করেই দেয়া হয়েছে।

১৮. আহমদ ইবন ফারিস, *মু'জামু মাকাঈসুল লুগাহ* (বৈরূত: দারুইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ২০০১খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬২

১৯. মানসূর বিন ইউনূস আল-বাহুতী, *শরহ মুনতাহাল ইরাদাত*, তাহকীক: আব্দুল মুহসিন তুরকী (বৈরূত: আলিমুল কুতুব, ১৪১৪হি./ ১৯৯৩খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৫০

শরীয়তে ইজারা বৈধ হওয়ার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ - قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.﴾

তাদের একজন বললো, হে পিতা! তুমি একে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত কর, কারণ তোমার শ্রমিক হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। তিনি (মূসা আ. কে) বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।[২০]

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত,

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا - الْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلاَثٍ فَارْتَحَلاَ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ

নবী স. ও আবু বকর রা. বনী দীলের এক ব্যক্তিকে, (যে পরবর্তীতে বনী আবদ ইব্‌ন আদীর সদস্য হয়েছিল) ইজারা নিলেন। সে একজন দক্ষ পথ প্রদর্শক ছিল (খিররিত হলো দক্ষ পথ প্রদর্শক)। সে 'আস ইব্‌ন ওয়ায়িলের বংশের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। সে লোকটি কাফির কুরাইশদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তারা তাকে নিরাপদ মনে করলেন; তাই তারা তাকে তাদের বাহন দু'টি সোপর্দ করলেন ও তাকে তিন রাত পরে সওর পর্বতের দ্বারে উপস্থিত হওয়ার জন্য অঙ্গীকার নিলেন। সে তাদের নিকট তাদের দুই বাহন নিয়ে তিন রাত পরে ভোরবেলা হাযির হলো। যখন তারা যাত্রা শুরম্ন করলেন। তাদের সাথে আমির ইব্‌ন ফুহাইরা ও দীল গোত্রের পথ প্রদর্শকও চলল। সে তাদের নিয়ে মক্কার নিম্নভূমি নদীর কিনারা দিয়ে যাত্রা করল।[২১]

এ ব্যাপারে আরও অনেক দলীল কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় বিদ্যমান। ইজারা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ ঐকমত্য হয়েছেন। ইমাম শাফিয়ী [৭৬৭-

---

২০. আল-কুরআন, ২৮ : ২৬-২৭

২১. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামি' আস-সহীহ* [একখণ্ডে], (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ ১৪২৪হি./২০০৩খ্রি.), অধ্যায়ঃ আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদঃ ইসতিজারিল মুশরিকীন ইনদাজ জরুরাহ, পৃ. ৪০৩, হাদীস নং ২২৬৩

৮২০খ্রি.], ইবন রুশদ [১১২৬-১১৯৮খ্রি.], আস-সারখসী [মৃ. ১১০৬খ্রি.], আদ-দারদীর [১৭১৫-১৭৮৬খ্রি.], আল-হাত্তাব [১৪৯৭-১৫৪৭খ্রি.], আর-রামলী [মৃ. ১৫৫০খ্রি.], ইবন কুদামা [১১৪৭-১২২৩খ্রি.] প্রমুখ উক্ত ইজমা' বর্ণনা করেছেন।[২২]

খ. বাই' (البيع):

বাই' (الْبَيْعُ) শব্দটি بَاعَ-يَبِيعُ -এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ : مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ 'মালের বিনিময়ে মাল আদানপ্রদান করা।' কোনো কোনো গ্রন্থে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে : مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ 'বস্তুর বদলে বস্তুর বিনিময়।' অন্য কথায় : دَفْعُ عِوَضٍ وَأَخْذُ مَا عُوِّضَ عَنْهُ 'কোন বস্তু প্রদান করে তার বদল হিসাবে অন্য কিছু গ্রহণ করা।' শব্দটি একই সাথে পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রদান করে। তাই বাই'-এর অর্থ বিক্রয় ও ক্রয় উভয়টিই হয়, যেমন শিরা (الشِّرَاءُ)-এর অর্থ ক্রয় ও বিক্রয় উভয়টি হয়। কখনো এ দুটি শব্দের একটি বলে অপরটি বোঝানো হয়। তাই বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কে আরবী ভাষায় بَائِع(বায়ি') ও بَيِّع (বায়্যি') বলা হয়।[২৩]

সকল ফকীহ্ এ কথায় একমত, বাই' বা বিক্রি ও ব্যবসায় শরীয়তসিদ্ধ বৈধ কাজ। তার বৈধতা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত।

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ "আল্লাহ বাই' তথা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন।"[২৪]

---

২২. মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফিয়ী, *আল-উম্ম* (বৈরূতঃ দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ২০০০খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৫; আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ* (বৈরূতঃ মুআস্সাসাতুল মা'আরিফ, ২০০৬খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৩৩৯; মুহাম্মদ ইবন আহমদ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত* (বৈরূতঃ দারুন নাওয়াদির, ২০১৩খ্রি.), খ. ১৫, পৃ. ৭৪; আবুল বারাকাত আহমদ ইবন মুহাম্মদ আদ-দারদীর, *আশ-শারহুস সাগীর আলা আকরাবিল মাসালিক ইলা মাজহাবিল ইমাম মালিক* (সংযুক্ত আরব আমিরাতঃ ইসলাম ও আওকাফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৮৯খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৬; মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-হাত্তাব, *মাওয়াহিবুল জালীল লি শারহি মুখতাসারি আল-খালীল* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৮৯; মুহাম্মদ ইবন আহমদ আর-রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শরহিল মানহাজ ফী ফিকহি আলা মাজহাবিল ইমাম আশ-শাফিয়ী* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৬১; মুওয়াফাকুদ্দীন আব্দুল ইবন আহমদ ইবন কুদামাহ, *আল-মুগনী* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছাহ, ১৪০১হি./১৯৮১খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২

২৩. *আল-মাওসূয়াহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়িতিয়্যাহ* (কুয়েতঃ আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪হি.), খ. ৯, পৃ. ৫

২৪. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

আরও ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾

তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ।[২৫]

রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَال: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُل بَيْعٍ مَبْرُورٍ

নবী করীম স.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন্ উপার্জন সর্বাধিক উৎকৃষ্ট? তিনি বললেন, 'মানুষের নিজ হাতের উপার্জন এবং সকল বৈধ ব্যবসা।'[২৬]

নবী করীম সা. নিজে বেচাকেনার কাজ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ কাজে তিনি স্বীকৃতিও দিয়েছেন। ইজমায়ে উম্মতও বেচাকেনা বৈধ হওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গ. শিরকাতুল মিলক (شركة الملك):

শিরকাহ (الشَّرِكَةُ) শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। বলা হয় : شَرِكَ الرَّجُل الرَّجُل فِي الْبَيْعِ وَالْمِيرَاث يَشْرَكُهُ شِرْكًا وَشَرِكَةً অর্থ : লোকটি ব্যবসা বা মীরাছে তার অংশ অপরের অংশের সাথে মিশ্রিত করল অথবা তাদের অংশ মিশ্রিত হলো। আর মিলক অর্থ মালিকানা। অতএব, 'শিরকাতুল মিলক' এর শাব্দিক অর্থ মালিকানায় একে অপরের অংশ মিশ্রিত হওয়া বা মালিকানায় অংশীদারিত্ব। যে চুক্তির মাধ্যমে দুজনের সম্পদে মিশ্রণ ঘটানো হয় তাকে 'শিরকাতুল মিলক' বা যৌথ মালিকানা বলা হয়।

ফিকহী পরিভাষায় শিরকাতুল মিলক বলা হয়:

أَنْ يَخْتَصَّ اثْنَان فَصَاعِدًا بِشَيْءٍ وَاحِد، أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِه

দুজন বা ততোধিক ব্যক্তি একটি বস্তু বা অনুরূপ কোনো কিছুতে বিশেষভাবে মালিক হওয়া।[২৭]

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে শিরকাতুল মিলক শরী'আহসম্মত হওয়ার অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث ﴾

তারা এক তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে।[২৮]

---

২৫. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

২৬. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, ব্যাখ্যা: আহমদ মুহাম্মদ শাকির (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪১৬হি./ ১৯৯৫ খ্রি.), মুসনাদুশ শামিয়্যিন, হাদীসে রাফি' বিন খাদীজ, খ. ৪, পৃ. ১৪১, হাদীস: ১৭৩০৪

২৭. *আল-মাওসূয়াহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়িতিয়্যাহ*, খ. ২৬, পৃ. ২০

২৮. আল-কুরআন, ৪ : ১২

অন্য আয়াতে এসেছে:

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾

আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, তোমাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে অংশীদার? ফলে তোমরা এ ব্যাপারে সমান? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ ভয় কর পরস্পর পরস্পরকে?[২৯]

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন:

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما

আমি দুই শরীকের মাঝে যৌথ কারবারকারী তৃতীয় ব্যক্তি, যতক্ষণ না একজন তার সঙ্গীর সাথে খেয়ানত করে। যখন খেয়ানত করে তখন আমি তাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে যাই।[৩০]

অতএব প্রমাণিত হলো, ইজারা, বাই' ও শিরকাতুল মিলক স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি শরী'আহসম্মত চুক্তি। ফকীহগণ এগুলোর বৈধতার ব্যাপারে কোন মতভেদ করেননি। তবে একই লেনদেনে এসব চুক্তির সম্মিলন বৈধ কি না সে বিষয়ে ফকীহগণের মতপার্থক্য রয়েছে।

২. একাধিক চুক্তির সম্মিলন

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, মালিকানা প্রদানের শর্তে ভাড়া বিষয়ক পদ্ধতিগুলো একক চুক্তিতে সম্পাদিত হয় না। বরং একাধিক চুক্তি একত্রিত হয়ে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। যেমন 'ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিলক' ইজারা, বাই' ও শিরকাতিল মিলক এ তিনটি চুক্তির সমন্বিত রূপ। ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলীক ইজারা, বাই' বা হিবার ভিত্তিতে গঠিত হয়। ইজারা ছুম্মা বাই'ও একাধিক চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এমনকি এক গবেষণায় উঠে এসেছে, মালায়শিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং জগতে অনুশীলিত ইজারা ছুম্মা বাই' পদ্ধতিটি মোট সাতটি চুক্তির সমাহার।[৩১]

---

২৯. আল-কুরআন, ৩০ : ২৮

৩০. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আছ আসসিজিস্তানী, *আস-সুনান* [একখণ্ডে], (রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪৩০হি./২০০৯খ্রি.), কিতাবুল বুয়ূ, বাবুন ফীশ শরীকাহ, পৃ. ৬৮৬, হাদীস নং: ৩৩৮৩

৩১. চুক্তি সাতটি হলো, ১. সম্পদের মালিক ও ব্যাংকের মধ্যকার ওকালা চুক্তি, ২. সম্পদের মালিক ও ব্যাংকের মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি, ৩. ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যকার ভাড়া চুক্তি, ৪. ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ভাড়া দেওয়া সম্পদ মেয়াদ শেষে ক্রয় অথবা ফেরত দেয়ার এখতিয়ার প্রদানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত চুক্তি, ৫. ভাড়ার কিস্তি প্রদানের জন্য মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে সঞ্চয়ী হিসাব খোলার মাধ্যমে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার মুদারাবা চুক্তি, ৬. গ্রাহক ও ইন্সুরেন্স কোম্পানির

ফকীহগণ এক লেনদেনে একাধিক চুক্তি একত্রিত করার বৈধতা নিয়ে মতভেদ করেছেন, হানাফী,[৩২] মালিকী[৩৩], শাফিয়ী,[৩৪] ও হাম্বলী[৩৫] মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে, একই লেনদেনে একাধিক চুক্তির সম্মিলন বৈধ নয়। তারা মহানবী সা.-এর হাদীস থেকে প্রমাণ পেশ করেন। যেখানে তিনি "এক বেচাকেনায় দুই বেচাকেনা"[৩৬] ও "এক লেনদেনে একাধিক লেনদেন"[৩৭] থেকে নিষেধ করেছেন। অন্য মত অনুযায়ী, একই লেনদেনে একাধিক চুক্তির সম্মিলন বৈধ। ইমাম মালিক [৭১১-৭৯৫খ্রি.][৩৮] সহ প্রত্যেক মাযহাবের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফকীহ এ মত পোষণ করেন। এছাড়া হাম্বলী ফকীহগণের মধ্যে ইবন তাইমিয়া [১২৬৩-১৩২৮খ্রি.][৩৯] ও ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ [১২৯২-১৩৫০খ্রি.][৪০] একাধিক চুক্তির সম্মিলন অথবা এক চুক্তিতে অন্য চুক্তির শর্তারোপ বৈধ গণ্য করেছেন। তারা শরীআহ বিরোধী নয় এমন শর্ত ও চুক্তি পালন সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের ব্যাপকার্থ থেকে এর পক্ষে প্রমাণ পেশ করেন।[৪১]

মধ্যকার ইন্সুরেন্স চুক্তি, ৭. ভাড়ার কিস্তি পরিশোধের পর গ্রাহক উক্ত সম্পদ ক্রয় করতে চাইলে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যকার মুরাবাহা চুক্তি। দ্রঃ মুস্তফা শামসুদ্দীন, আকদুল ইজাবাহ ছুম্মাল বাই': দিরাসাহ নাকদিয়্যাহ, পৃ. ২৯

৩২. আস সারখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ১৩, পৃ. ১৬

৩৩. ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ. ২, পৃ. ১১৫

৩৪. আর-রামলী, *নিহায়াতুল মুজতাহিদ*, খ. ৩, পৃ. ৪৫০

৩৫. ইবন কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ৪, পৃ. ২৯১

৩৬. "بيعتان في بيعة" দ্রঃ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-জামি'আস-সুনান* (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফা, ১৪২৩হি./২০০২খ্রি.), কিতাবুল বুয়ূ, বাবু মা জাআ ফীন নাহী আন বাইয়াতাইন ফী বাইয়াতিন, পৃ. ৫২০, হাদীস নং ১২৩১

৩৭. "صفقتان في صفقة واحدة" ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, মুসনাদুল মুকাছিরীন মিনাস সাহাবাহ, মুসনাদি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, খ. ৪, পৃ. ৩০, হাদীস নং ৩৭৮৩

৩৮. ইমাম মালিক বিন আনাস, *আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা* (বৈরূতঃ দারু সাদির, ২০০৫খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৬১৭

৩৯. আহমাদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন তাইমিয়া, *মাজমুউল ফাতওয়া* (কায়রোঃ দারুল হাদীছ, ২০০৬খ্রি.), খ. ২৯, পৃ. ১৩২

৪০. মুহাম্মদ ইবন আবু বকর ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আলামুল মুয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন* (রিয়াদঃ দারু ইবনুল জাওযী, ২০০২খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৮২

৪১. যেমন আল্লাহর বাণী: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারসমূহ পূরণ কর।" (আল-কুরআন, ৫: ১) মহানবী সা. বলেনঃ والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما "মুসলমানগণ তাদের শর্ত পালনে বদ্ধপরিকর শুধুমাত্র ঐ শর্ত ব্যতীত, যা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে। দ্র. তিরমিযী, কিতাবুল আহকাম আন রাসূলিল্লাহি সা., বাবু মা জুকিরা আন রাসূলিল্লাহি ফীস সুলহি বায়নান নাস, হাদীস নংঃ ১৩৫২

এ প্রসংগে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণ সংস্থা AAOIFI[৪২] প্রণীত শরীআহ মানদণ্ডে উল্লেখিত ধারাটি প্রণিধানপ্রাপ্ত। "এক নথিতে একাধিক চুক্তির সম্মিলন বৈধ, তবে এক চুক্তির মধ্যে অন্য চুক্তি পূরনের শর্তারোপ করা যাবে না। কেননা, পৃথকভাবে প্রত্যেকটি চুক্তিই বৈধতার বিধান রাখে। উপরন্তু, এর প্রতিবন্ধকতা প্রমাণকারী কোন শরয়ী দলীলও নেই।"[৪৩]

৩. বিনিময় চুক্তিকে শর্তযুক্ত করা

ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক, ইজারা মুনতাহিয়্যা বিততামলীক ও ইজারা ছুম্মা বাই' এর প্রায়োগিক রূপ বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয়, এগুলোর মূল চুক্তি তথা 'ইজারা' একটি বিনিময় চুক্তি (عقد معاوضة), তদুপরি এসব প্রডাক্টের রূপায়নের স্বার্থে বিনিময় চুক্তি তথা ইজারাকে বিভিন্ন শর্তেযুক্ত করা হয়েছে, ফকীহগণ যেগুলোকে ইজারা চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করেননি। যেমন ভাড়া প্রদত্ত সম্পদের ইন্স্যুরেন্স, ইজারা চুক্তির মেয়াদের অন্তবর্তী সময়ে ভাড়া দানকারীর উক্ত সম্পদে বাড়তি হস্তক্ষেপ, ভাড়াপ্রদত্ত সম্পদের বিক্রয় ইত্যাদি। অতএব, বিনিময় চুক্তিকে এক বা একাধিক শর্তযুক্ত করার বিধান আলোচনার দাবি রাখে। এসম্পর্কে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন:

ক. হানাফীগণ বলেন, চুক্তির সাথে অপ্রাসংগিক, অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা অকার্যকর শর্ত যুক্ত করা হলে তা ফাসিদ হিসেবে গণ্য।[৪৪] অতএব, তাদের দৃষ্টিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রাসংগিক শর্ত বিবেচ্য।

খ. মালিকীগণের মতে, শর্ত যুক্ত করা বৈধ, যদি তা কোন শরয়ী নিষেধাজ্ঞায় লিপ্ত হবার উপলক্ষে পরিণত না হয় বা চুক্তির মূল দাবি বিরোধী না হয়।[৪৫]

---

৪২. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) বা هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত বাহরাইন ভিত্তিক একটি সংস্থা। যা বিশ্বব্যপী ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শরী'আহ নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করে থাকে। সংস্থাটি ইতোমধ্যে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মূলনীতি, হিসাব সংরক্ষণ, নিরীক্ষণের বেশ কিছু শরয়ী মানদ- প্রকাশ করেছে।

৪৩. *আল-মাআঈর আশ শারঈয়্যাহ* (বাহরাইন: হাইয়াতুল মুহাসাবাহ ওয়াল মুরজাআহ লিল মুআসসাসাতিল মালিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ, ২০১৪) ধারা ৩, মানদ- নং ২৫ (আল-জাময়ু বাইনাল উকূদ), পৃ. ৪২১

"يجوز اجتماع أكثر من عقد في منظومة واحدة بدون اشتراط عقد في عقد، إذا كان كل واحد منها جائزا بمفرده، ما لم يكن هناك دليل شرعي مانع"

৪৪. মুহাম্মদ আমীন ইবন উমর ইবন আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররুল মুখতার* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ২০০০খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২৮২

৪৫. ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ. ৫, পৃ. ৩

গ. শাফিয়ীগণের দৃষ্টিতে চুক্তির সাথে চার প্রকার শর্ত সংযুক্ত করা বৈধঃ যা চুক্তির মূল দাবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা এর প্রাসঙ্গিক, যে ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর নস রয়েছে এবং যার মধ্যে চুক্তির উদ্দেশ্য অর্জিতও হয় না বা লঙ্ঘিতও হয় না, আবার তাতে কোন ক্ষতিও নেই।[৪৬]

ঘ. হাম্বলীগণের মতে, চুক্তিতে শর্ত সংযুক্ত করা সহীহ; তবে যে সব শর্তে শরী'আহ ও চুক্তির মূল উদ্দেশ্য লংঘিত হয় তা ব্যতীত।[৪৭]

অতএব বলা যায়, কোন বিনিময় চুক্তিতে বিশেষ কোন শর্তারোপ করা মৌলিকভাবে বৈধ। তবে যেসব শর্তে শরীআহ লংঘিত হয় বা চুক্তিকে তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে এ জাতীয় শর্ত সংযুক্ত করা হলে তা পরিত্যাজ্য হবে।

৪. বিক্রয় চুক্তিকে ভবিষৎ শর্তের সাথে সংযুক্ত করা

উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগকৌশল থেকে স্পষ্ট হয় যে, এ ক্ষেত্রে সম্পদের বিক্রয় ভাড়ার কিস্তি পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়টি সম্পূর্ণভাবে কিস্তি পরিশোধের উপর নির্ভরশীল। কিস্তি পরিশোধ সমাপ্ত হলেই কেবল ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ফকীহগণ বিক্রয়কে কোন শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট করার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। চার মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় কোন শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট করা বৈধ নয়।[৪৮] কেননা এটি চুক্তির মূল দাবি বিরোধী। যেহেতু চুক্তির মূল চাহিদা তা তাৎক্ষণিক কার্যকর হওয়া, ঝুলন্ত থাকা নয়। তবে ইমাম ইবন তাইমিয়া ও ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যার মতে ক্রয়-বিক্রয়কে বিশেষ শর্তের উপর নির্ভরশীল করা বৈধ।[৪৯]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ

ونحن بينا في غير هذا الموضع أنه يجوز تعليق العقود بالشروط، إذا كان في ذلك منفعة للناس، ولم يكن متضمنا ما نهى الله عنه ورسوله، فإن كل ما ينفع الناس، ولم يحرمه الله ورسوله هو

---

৪৬. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাজর আল-হায়ছামী, *তুহফাতুল মুহতাজ ফী শারহিল মিনহাজ* (মিসরঃ আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১৩৫৭হি./১৯৮৩খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৫৩

৪৭. মুওয়াফ্ফাকুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন কুদামা, *আশ শারহুল কাবীর আলা মাতনিল মুকনা* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৯খ্রি.). খ. ১১, পৃ. ২৩

৪৮. আবূ বকর মুহাম্মদ আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে'ফী তারতীবিশ শারায়ে'* (বৈরূতঃ দারুল মা'আরিফ, ২০০০খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৮৫; শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন ইদরীস আল-কারাফী, *আল-ফুরূক* (বৈরূতঃ দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৯৬; মুহাম্মদ ইবন আহমদ আশ শারবিনী, *মুগনী আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মা'আনী আলফাজিল মিনহাজ* (কায়রোঃ দারুল হাদীছ, ২০০৬খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৭; ইবন কুদামাহ, *আশ শারহুল কাবীর*, খ. ৪, পৃ. ৬৬

৪৯. আহমদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন তাইমিয়া, *নজরিয়্যাতুল আকদ* (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফা, ১৯৬০খ্রি.), পৃ. ২২৭; আল-জাওয়িয্যাহ, *আলামুল মুয়াক্কিঈন*, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯

من الحلال الذي ليس لأحد تحريمه. وذكرنا عن أحمد جواز تعليق البيع بشرط، ولم أجد عنه ولا عن قدماء أصحابه نصا بخلاف ذلك، بل ذكر من ذكر من المتأخرين أن هذا لا يجوز، كما ذكر ذلك أصحاب الشافعي.

আমরা একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছি যে, চুক্তিকে বিশেষ শর্তের উপর নির্ভরশীল করা বৈধ, যদি তাতে মানুষের কল্যাণ নিহিত থাকে এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিষেধজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত না হয়। কেননা যা কিছু মানবতার কল্যাণ সাধন করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা নিষিদ্ধও করেননি সেগুলো অবশ্যই বৈধতার অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম করার অধিকার কারও নেই। আমরা ইমাম আহমদ থেকে ক্রয়-বিক্রয়কে শর্তের সাথে যুক্ত করার বৈধতা বর্ণনা করেছি। তাঁর বা পূর্বসূরী তাঁর কোন সাথী থেকে এর বিরোধী কোন উক্তিও আমি পাইনি। বরং উত্তরসূরী কেউ কেউ একে অবৈধ বলেছে, যেমন শাফিয়ী মাযহাবের অনেকে এমনটি বলে থাকেন।[৫০]

এ মাসআলায় দ্বিতীয় পক্ষ তথা ক্রয়-বিক্রয়কে কোন শর্ত বা শর্তাবলির সাথে যুক্ত করা বৈধ হওয়ার মতকে অধিকতর অগ্রগণ্য বিবেচনা করা যায়। কেননা মহানবী সা. এর সুন্নাহে এর প্রয়োগ দেখা যায়। তিনি নেতৃত্বের চুক্তিকে শর্তযুক্ত করেছিলেন। যেমন তিনি মুতার যুদ্ধে জাফর বিন আবি তালিবের সেনাপতিত্বকে যায়িদ বিন হারিছা এর মৃত্যু বা শাহাদাতের শর্তের উপর এবং আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহার সেনাপতিত্বকে জাফর বিন আবু তালিব রা. এর মৃত্যু বা শাহাদাতের শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট করেন।[৫১]

৫. হিবাকে শর্তযুক্ত করা

যারা 'ইজারা মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক'-এর মালিকানা হস্তান্তরের পদ্ধতিকে হিবা দিয়ে অভিযোজন করেন, তাদের মতানুযায়ী হিবাকে কিস্তি পরিশোধের শর্তযুক্ত করা হয়। অর্থাৎ এ শর্ত প্রদান করা হয় যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিস্তিসমূহ পরিশোধ করা হলেই কেবল হিবার মাধ্যমে সম্পদটির মালিকানা স্থানান্তর করা হবে। ফকীহগণ হিবাকে শর্তযুক্ত করার বৈধতার প্রশ্নে মতভেদ করেছেন। হানাফী, শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের জমহুর ফকীহের মতে, হিবাকে কোন শর্তের আবর্তে যুক্ত করা বৈধ নয়। কেননা হিবা একটি মালিকানা প্রদানকারী চুক্তি, যা তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হয়। যদি একে ভবিষ্যতের কোন শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ করা হয় তবে উক্ত মালিকানাকে অস্পষ্টতা ও ঝুঁকির দিকে নিয়ে যায়।[৫২] কিছু কিছু হানাফী ফকীহ,[৫৩] মালিকী

---

৫০. ইবন তাইমিয়া, *নাজরিয়্যাতুল আকদ*, পৃ. ২২৭

৫১. মূল হাদীসটি দ্র. আল-বুখারী, *আল-জামি' আস-সাহীহ*, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গুযয়াতে মুতআ মিন আরদিশ শাম, পৃ. ৭৬৯, হাদীস নং-৪২৬১

৫২. আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে'*, খ. ৫, পৃ. ১৬৮; আর-রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৫, পৃ. ৪০৯; মানসূর ইবন ইউনূস আল-বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা'* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩০৭

মাযহাব,[৫৪] হাম্বলী মাযহাবের ইবন তাইমিয়া[৫৫] ও ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যা [৫৬] এর মতে, এক্ষেত্রে পরিচিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সংগত শর্তারোপ বৈধ। যদি তার মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত থাকে এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত না হয়। কেননা হিবা একটি দাক্ষিণ্য চুক্তি, যাতে অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা ও ঝুঁকি বিবেচ্য হয় না। তা ছাড়া দানকারীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে যে, তিনি তার দানকে হারাম বিষয় হালাল ও হালাল বিষয় হারাম না হওয়া পর্যন্ত যে কোন শর্তের সাথে যুক্ত করতে পারেন। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ "যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের উপর অভিযোগের কোন হেতু নেই"।[৫৭]

অতএব এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হিবা একটি দাক্ষিণ্যচুক্তি হওয়ায় হিবাকারী তাকে শর্তযুক্ত করার অধিকার রাখেন। ফলে একে কোন নির্দিষ্ট শর্ত বা শর্তাবলির সাথে যুক্ত করা বৈধ। এর প্রমাণ উম্মু কুলসূম বিনতি আবি সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন উম্মে সালমাকে বিবাহ করেন তখন তাকে বলেন :

> إني قد أهديت للنجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك
>
> আমি নাজ্জাশীর কাছে এক সেট কাপড় ও কয়েক উকিয়া মিশক উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেছি। অথচ নাজ্জাশী মৃত্যুবরণ করেছে, আমার মনে হয়, আমার উপঢৌকন আমার কাছেই ফিরে আসবে। যদি ফেরত আসে তবে তা তোমার।" বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর ধারণা মত উক্ত উপঢৌকন তাঁর কাছে ফেরত আসে। তখন তিনি তার প্রত্যেক স্ত্রীকে এক উকিয়া পরিমাণ মিশক প্রদান করেন এবং উম্মে সালমাকে বাকি মিশক ও কাপড় প্রদান করেন।[৫৮]

৬. প্রতিশ্রুতিপূরণ বাধ্যতামূলক

এ সব পদ্ধতির প্রয়োগপ্রক্রিয়া থেকে স্পষ্ট হয় যে, এ ক্ষেত্রে একপক্ষ অন্য পক্ষের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। যেমন ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিলকে অংশীদারিত্ব চুক্তি বাস্তবায়নের পূর্বেই ব্যাংক গ্রাহককে প্রতিশ্রুতি

---

৫৩. দ্র. আফনাদী, *হাশিয়াতু কুররাতু উয়িনিল আখইয়ার তাকমিলাতু রাদ্দিল মুহতার* (করাচী: মাকতাবা মাজিদিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৩১

৫৪. ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ. ২, পৃ. ২৪৭

৫৫. ইবন তাইমিয়া, *নাজরিয়্যাতুল আকদ*, পৃ. ২২৭

৫৬. আল-জাওযিয়্যাহ, *আলামুল মুআক্কিঈন*, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯

৫৭. আল-কুরআন, ৯ : ৯১

৫৮. ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, মুসনাদুল কাবাঈল, হাদীসু উম্মে কুলসুম বিনতে আকবাহ, খ. ১৪, পৃ. ৪৯১, হাদীস নং-২৭১৫১

দেন যে, তাদের যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ তার কাছে ভাড়া প্রদান করবেন ও কিস্তিতে তা বিক্রি করবেন। ইজারা মুনতাহিয়্যাহ বিত তামলিকে ব্যাংক গ্রাহককে ভাড়ায়প্রদত্ত সম্পদটি টোকেন মূল্যে বিক্রয় বা হিবা করার প্রতিশ্রুতি দেন। একইভাবে 'ইজারা ছুম্মা বাই' পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহককে উক্ত সম্পদ ক্রয় করার বা ফেরত দেয়ার এখতিয়ার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। এসব বদান্যতামূলক প্রতিশ্রুতি পূরণ বাধ্যতামূলক কিনা সে বিষয়ে ফকীহগণ থেকে তিনটি মত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম মত অনুযায়ী ওয়াদা পালন মুস্তাহাব। জমহুর ফুকাহা এমত ব্যক্ত করেছেন। তারা প্রমাণ হিসেবে যায়েদ ইবনে আরকাম রা. বর্ণিত হাদীসটি পেশ করেন। যেখানে মহানবী স. বলেন :

إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف يجيء للميعاد فلا إثم عليه

কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে কোন ওয়াদা করলে তার নিয়্যাত যদি থাকে ওয়াদা পূরণ করার, কিন্তু কারণ বশত পূরণ না করলে...তার কোন অপরাধ নেই।[৫৯]

তারা এ জাতীয় প্রতিশ্রুতিকে হিবার সাথে তুলনা করেন। হিবা করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হয় না।[৬০]

দ্বিতীয় মতানুযায়ী সামগ্রিকভাবে সবধরনের প্রতিশ্রুতি পালন আবশ্যক। এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন, ইবনুল আশওয়া[৬১], ইবন শুবরামা [১৪৪ হি.], উমর ইবন আব্দুল আযীয [৬৮১-৭২০ খ্রি.], হাসান বাসরী [৬৪২-৭২৮ খ্রি.], ইবনুশ শাত মালিকী [৬৪৩-৭২৩ হি.], ইবনুল আরাবী [১০৭৬-১১৪৮ খ্রি.], ইমাম জাসসাস

---

৫৯. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, কিতাবুল আদব, বাবুন ফিল উদ্দাহ, পৃ. ৯৮৫, হাদীস ৪৯৯৫

৬০. আস-সারখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ২, পৃ. ১২৯; মুহাম্মদ আমীন ইবন আবিদীন, *আল-উকূদুদ দুররিয়্যাহ ফী তানকীহিল ফাতওয়া আল-হামিদিয়্যাহ* (কায়রো: মাতবাআতুল মায়মানাহ, ১৩১০ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৫৩; মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন ঈল্লীশ, *ফাতহুল আলী আল-মালিক ফীল ফাতওয়া আলা মাজাহিবিল ইমাম মালিক* (বৈরূত: দারুল ফিকর, তারিখবিহীন), খ. ১, পৃ. ২৫৪; ইবন রুশদ আল-জাদ (জৈষ্ঠ্য ইবন রুশদ), *আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল* (বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামী, ১৪২৩হি./২০০২খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১৮; আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শরফ আন-নাভভী, *আল-আজকার* (দাম্মাম: দারু ইবনুল জাওযী, ২০১১খ্রি.), পৃ. ২৮১-১৮২; আহমদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী ফী শারহি সহীহিল বুখারী* (বৈরূত: মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ২০০৯খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৯০; আল-বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা*, খ. ৩, পৃ. ৩৬৩; ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবনুল মুফলিহ, *আল-মুবদা'ফী শারহিল মুকনা'* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৩৪৬; আলী ইবন আহমদ ইবন ইবন হাযম, *আল-মুহাল্লা* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ২০০১খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২৮

৬১. তার পূর্ণ নাম সাঈদ ইবন আমর ইবন আল-আশওয়া আল-হামদানী। তিনি খালিদ আল-কাসরীর আমলে কুফার বিচারপতি ছিলেন, তার জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে গবেষক কিছু জানতে পারেনি।

[৯১৭-৯৮০ খ্রি.] প্রমুখ।[৬২] তারা তাদের মতের সমর্থনে কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেন। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা কেন বল?[৬৩]

মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, সামগ্রিকভাবেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও ওয়াদা পূরণ আবশ্যক, তাতে যাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃঢ়তা থাকুক বা না থাকুক।[৬৪]

মহানবী স. ওয়াদা ভঙ্গকরা বা প্রতিশ্রম্নতি রক্ষা না করাকে নিফাকের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করেছেন।[৬৫]

ইমাম কারাফী বলেন:

> إن النبي ρ عد من خصال المنافقين إخلاف الوعد، والنفاق محرم فكان إخلاف الوعد محرما، فالوفاء بالوعد واجب
>
> মহানবী স. ওয়াদা খেলাফ করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নিফাক হারাম বিধায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকরাও হারাম। সুতরাং ওয়াদা রক্ষা করা অপরিহার্য।[৬৬]

তৃতীয় মতানুযায়ী ওয়াদা যদি কোন কিছুর সাথে সংযুক্ত হয় তবে তা রক্ষা করা অপরিহার্য। এটি ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত একটি মত। এ ছাড়াও এ মত পোষণকারীগণের মধ্যে রয়েছেন, ইবন নুজাইম [৯২৬-৯৭০ হি.], ইবনুল কাসিম [৭৫০-৮০৬ খ্রি.], প্রমুখ।[৬৭] তারা উপরিউক্ত ১ম ও ২য় মতের দলীলসমূহ উপস্থাপন

---

৬২. ইবন রুশদ আল-জাদ, *আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল*, খ. ৮, পৃ. ১৮; ইবন হাযম, *আল-মুহাল্লা*, খ. ৮, পৃ. ২৮; কাসিম ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুশ শাত, *আদরারুশ শুরূক আলা আনওয়ারুল ফুরূক* (বৈরূতঃ আলিমুল কিতাব, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ২৪; মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৮২; আহমদ ইবন আলী আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৪২

৬৩. আল-কুরআন, ৬১ : ২

৬৪. ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম* (কায়রোঃ দারুল গাদ আল-জাদীদাহ, ২০০৭খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৮২; আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৪৪২

৬৫. বুখারী, *আল-জামি' আস সাহীহ*, কিতাবুল ঈমান, বাবু আলামাতিন নিফাক, পৃ. ২২; হাদীসঃ ৩৩ ও ৩৪; মুসলিম, *আল-মুসনাদ আস সাহীহ*, কিতাবুল ঈমান, বাবু খিসালিল মুনাফিক, পৃ. ৮৭ হাদীস নং ২০৭-, ২০৮, ২০৯ ও ২১০

৬৬. আল-কারাফী, *আল-ফুরূক*, খ. ৩, পৃ. ২৪

৬৭. ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানা আল-কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৪৬; ঈল্লীশ, *ফাতহুল আলী*, খ. ১, পৃ. ২৫৬; যায়নুদ্দীন ইবন ইবরাহীম ইবন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাজাঈর* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৪৪; আল-কারাফী, *আল-ফুরূক*, খ. ৩, পৃ. ২৫;

করে বলেন, যেহেতু এ ব্যাপারে শরীআতের পরস্পর বিরোধী দলীল রয়েছে যার কিছু দ্বারা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পূরণ আবশ্যক প্রমাণিত হয় এবং কিছু দলীল দ্বারা এর আবশ্যকতা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, ওয়াদা যদি চুক্তি বা অন্য কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে তবে তা পূরণ করা আবশ্যক। অন্যথায় মুস্তাহাব।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ওয়াদা পূরণ করা অপরিহার্য। কেননা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একজন মুসলিম যেসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মুনাফিক থেকে পৃথক হয় এটি তার অন্যতম। এ অপরিহার্যতা আরও জোরালো হয় যদি উক্ত প্রতিশ্রুতি কোন কিছুর সংঘটক হয় এবং প্রতিশ্রুত ব্যক্তি এর উপর ভিত্তি করে কোন কাজে প্রবেশ করেন। এ ক্ষেত্রে যদি উক্ত ওয়াদা পূরণ করা না হয় তবে প্রতিশ্রুত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। অথচ কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ও নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। মহানবী সা. বলেনঃ

لا ضرر ولا ضرار

কাউকে ক্ষতি ও পাল্টা ক্ষতি করা যাবে না।[৬৮]

ওআইসিভুক্ত ইসলামী ফিকহ একাডেমী ও AAOIFI-এর শরীআহ স্টান্ডার্ডও এ মত ব্যক্ত করেছে।[৬৯]

উপসংহার

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রচলিত হায়ার পারচেজ বা ভাড়ান্তে ক্রয়-এর যেসব প্রডাক্ট রয়েছে তা প্রায়োগিক দিক থেকে আধুনিক হলেও এতে অন্তর্ভুক্ত শর'য়ী চুক্তিসমূহ নিয়ে পূর্বসূরী ফকীহগণ ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুশীলিত 'ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' পদ্ধতিটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি এদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে দ্বিতীয় বৃহত্তর বিনিয়োগ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট শরী'আহ অনুষঙ্গসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করতে পারলে এ পদ্ধতির সম্পূর্ণ শরী'আহভিত্তিক প্রয়োগ সম্ভব। এ ক্ষেত্রে শরী'আহ লঙ্ঘনের সম্ভাব্য যেসব দিক রয়েছে তা অবশ্যই এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ।

---

৬৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাযাহ, *আস সুনান* (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২০হি./১৯৯৯খ্রি.), আবওয়াবুল আহকাম, বাবু মান বানা ফী হাক্কিহি মা ইয়াদুররু বিজারিহী, পৃ. ৩৩৫, হাদীস ২০৪০ ও ২৩৪১

৬৯. ওআইসি অধিভুক্ত ইসলামী ফিকহ একাডেমির পঞ্চম অধিবেশনের সিদ্ধান্ত নংঃ ৪০-৪১, কুয়েত, ডিসেম্বর ১৯৮৮; *আল-মা'আঈর আশ-শরঈয়্যাহ*, শরীআহ স্ট্যান্টার্ড নং ৮, পৃ. ১২২

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭
জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬

টেকসই উন্নয়ন : একটি ইসলামী বিশ্লেষণ

সাইয়েদ রাশেদ হাছান চৌধুরী*

Sustainable Development: An Islamic Analysis

ABSTRACT

The existence of a beautiful world cannot be imagined without considering socio-economic development and environment. Sustainable development is when an accelerated development process is maintained through a balance between the above two concepts and preserving a safe world for future generations. The United Nations has formulated sustainable development goals (2015-2030) to highlight the importance of the issue. Considering the importance of these matters, the government of Bangladesh also promulgated a national sustainable development strategy (2010-2021) in 2013. The prime objective of this study is to explain sustainable development strategy undertaken by the UN and the Bangladesh government and to explain the Islamic view related to the issue. Descriptive and analytic methods were followed in the preparation this article. Moreover, comparative methodology was also applied in specific cases. The research tries to show that the concept of sustainable development in Islam is wide and quite comprehensive and includes spiritual, moral and material dimensions at the same time. For this reason, it can easily be distinguished from the characteristics of western development model. In a capitalist societal framework, the prime objectives of sustainable development are to gain profit and to meet material needs. On the other hand, the prime objective of Islam in sustainable development is to ensure constructive production alongside the conservation of human values.

Keywords: Sustainable development; environment; National sustainable development strategy; Development in Islam; NSDS.

---

* স্নাতকোত্তর গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সার-সংক্ষেপ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশকে অবিবেচ্য রেখে একটি সুন্দর পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এই দু'য়ের যথাযথ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বিশ্ব সংরক্ষণ করে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায় তাকে টেকসই উন্নয়ন বলে। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০৩০) প্রণয়ন করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করেছে। এই অধ্যয়নের মূল লক্ষ্য জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন কৌশলের বিশেস্নষণ এবং এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। প্রবন্ধটি প্রণয়নে বর্ণনা ও বিশেস্নষণমূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে তুলনামূলক পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইসলামে টেকসই উন্নয়ন ব্যাপক অর্থবোধক ও বিস্তৃত এবং তা নৈতিক দিকসহ আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত দিকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ কারণেই একে পশ্চিমা উন্নয়ন মডেলের বৈশিষ্ট্য থেকে সহজেই পৃথক করা যায়। পুঁজিবাদী সমাজ শুধু মুনাফাকামিতা ও বস্তুগত চাহিদা পূরণকেই টেকসই উন্নয়নের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করে, কিন্তু ইসলাম গঠনমূলক উৎপাদনের পাশাপাশি মানবীয় মূল্যবোধ রক্ষা করাকেও টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

মূলশব্দ : টেকসই উন্নয়ন; জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র; ইসলামে উন্নয়ন।

ভূমিকা

সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশ ব্যতীত মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায়ও মানুষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে পারেনি। বিগত শতকের শুরুতে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, পরিবেশ যতই দূষিত হোক না কেন প্রকৃতির নিয়মে তা আবার পরিশোধিত হবে। বিংশ শতকের ৬০-৭০ এর দশকে পরিবেশের দূষণ নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে, পরবর্তীতে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পরিবেশ তাঁর নিজস্ব নিয়মে পরিশোধন হতে অক্ষম, মানুষকেই পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে। ২০১৫ সালে শেষ হতে যাওয়া সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের অগ্রগতির ধারা আরো বেগবান করার অভিপ্রায়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে ১৫ বছর মেয়াদি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বা Sustainable Development Goals (SDG)। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন শুধু বস্তুগত বিষয় নয়, বরং নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করে। এ উন্নয়ন সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনাকে অন্যসব টেকসই উন্নয়ন মডেল থেকে সহজেই পৃথক করা যায়।

টেকসই উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়ন একটি সমসাময়িক পরিভাষা। স্থিতিশীল উন্নয়ন বা উন্নয়নের স্থিতিশীলতা উভয় ক্ষেত্রে শব্দটির প্রয়োগ করা হয়। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Sustainable Development এবং আরবী প্রতিশব্দ التنمية المستدامة। পরিবেশকে ভিত্তি করে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন। অর্থাৎ পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হলো টেকসই উন্নয়ন। টেকসই উন্নয়ন বলতে শুধু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমান প্রজন্মের ভোগ সীমিতকরণকেই বোঝায় না, বরং এটি সংখ্যালঘিষ্ঠের অটেকসই ভোগের কারণে বর্তমান প্রজন্মের অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রক্রিয়া যেন বাধাগ্রস্ত না হয় তাও নিশ্চিত করে।[১] অতএব, টেকসই উন্নয়নের আরেকটি মাত্রা হচ্ছে আন্তপ্রজন্মগত সমতা। অন্যকথায়, টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সমবণ্টন।

টেকসই উন্নয়ন প্রসঙ্গে এস. শচিমেডেইনি বলেন:

> Sustainable Development is a new concept of development that emphasises the integration of environmental conservation and economic growth. Previously, the concept of development was synonymous with economic growth, which can be quantified by certain parameters such as Gross Domestic Product (GDP). In fact, the concept of Malaysian Journal of Science and Technology Studies development has a wider meaning than the concept of growth because development means increase of quality of life while growth only emphasises increase of the economy.

টেকসই উন্নয়ন হলো উন্নয়নের এমন এক নতুন ধারণা, যা পরিবেশ সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে সমন্বয় সাধনে গুরুত্ব আরোপ করে। পূর্বে উন্নয়নের ধারণাটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সমার্থবোধক হিসেবে বিবেচিত হতো, যা মূলত সুনির্দিষ্ট পরামিতি যেমন জাতীয় উৎপাদন (GDP) এর ভিত্তিতে পরিমাপ করা হতো। প্রকৃতপক্ষে, 'মালয়েশিয়ান জার্নাল অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্টাডিজ'

---

১. United Nations General Assembly, *Draft outcome document of the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda*, www.un.org/disabilities/documents/gadocs/a_69_l.85.docx, retrieved 15 July 2016.

এর দৃষ্টিতে উন্নয়নের ধারণা প্রবৃদ্ধির ধারণার চেয়ে ব্যাপকতর। কেননা উন্নয়ন অর্থ হলো, জীবন মানের উন্নয়ন পক্ষান্তরে প্রবৃদ্ধি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা।[২]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে:

টেকসই উন্নয়ন মূলত একটি প্রক্রিয়া, যা দ্বারা জনগণ তাদের চাহিদা মেটায়, তাদের বর্তমান জীবন মানের উন্নতি ঘটায় এবং সেই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে তাদের আপন চাহিদা পূরণ করতে পারে তাদের সেই সামর্থ্যের সুরক্ষা করে।[৩]

আর. ই. মুন টেকসই উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলেন:

The meaning of development in Sustainable Development refers to the quality enhancement of human and other spheres by achieving their basic needs. Clearly, the concept of development here has a more comprehensive meaning than economic growth.

টেকসই উন্নয়নে উন্নয়নের পরিভাষাটি মানব জাতির মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদের জীবন মান ও অন্যান্য সূচকের বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। বস্তুত এখানে উন্নয়নের ধারণাটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক।[৪]

টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও দিক রয়েছে। এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. মানুষের বাঁচার ন্যূনতম প্রয়োজন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পানি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রয়োজন মিটানো এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা;

২. জনসংখ্যাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধরে রাখা;

৩. আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পুনবণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ;

৪. খনিজ সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে তার আবর্তনের উপর জোর দেয়া;

৫. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে ভোগ;

---

২. S. Schmidheiny, *Changing Course: A Global Business Perspective on Development and Environment* (London: MIT Press, 1992), P. 373.

৩. সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, *জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০২০-২০২১)*; (ঢাকা: পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মে ২০১৩), পৃ. ০৫

৪. R. E. Munn, "Towards Sustainable Development: An Environmental Perspective" in *Economics and Ecology: Towards Sustainable Development*. ed. F. Archibugi, and P. Nijkamp (Dordrecht: Kluwer Academic Publications 1990), p. 25.

৬. পানি ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে রাখা;

৭. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার উপর জোর দেয়া;

৮. গ্রাম উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া, যাতে গ্রামের লোকেরা নিরন্তর শহরের দিকে না আসে;

৯. সুষম ভূমি ব্যবহার এবং তা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আনা;

১০. শক্তি তথা এনার্জির ক্ষেত্রে পুনর্নবায়নযোগ্য উৎসের ওপর নির্ভর করা।[৫]

অতএব বলা যায়, পরিবেশকে ভিত্তি করে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন। অর্থাৎ পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জিত হয়। যার লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, যেখানে প্রতিটি মানুষ উন্নয়নে অবদান রাখার ও এর সুফল ভোগের সুযোগ লাভ করে এবং একই সময়ে তারা প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা সহ সংরক্ষণ করে থাকে।

টেকসই উন্নয়নের ধারণা

জাতিসংঘ পরিবেশের বিষয়ে মুখ্য অধিবক্তা এবং টেকসই উন্নয়ন এর নেতৃস্থানীয় প্রচারকের দায়িত্ব পালন করছে। আন্তর্জাতিক আলোচ্যসূচিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের অবনতির বিষয়টি প্রথমে উপস্থাপিত হয় ১৯৭২ সালের ৫-১৫ জুন সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলন (United Nations Conference on the Human Environment)-এ। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব কমিশন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কাছে এ কমিশনের ১৯৮৭ সালের প্রতিবেদনেই উন্মুক্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিকল্প পথ হিসেবে টেকসই উন্নয়নের ধারণা উপস্থাপিত হয়। এ প্রতিবেদন বিবেচনা করে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন আহবান করে।[৬] ১৯৯২ এর ইউএনসিইডি-তে রিও ঘোষণায় টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য মোট ২৭টি নীতিমালার অনুমোদন করা হয়। ২০০২ সালের ২৬ আগস্ট - ৪ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানসবার্গে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে (World Summit on Sustainable Development-WSSD) রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা এজেন্ডা ২১ বর্ণিত টেকসই উন্নয়নের নীতি এবং

---

৫. World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*. (Oxford: Oxford University Press, 1987), p. 27.

৬. United Nations -Sustainable Development knowledge platform, "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=111&nr=8496&menu=35, Retrieved 23 July 2016

অন্যান্য বিধিমালার বিষয়ে পুনরায় ঐকমত্য হয়। সম্মেলনে মোট ৩৭ টি ঘোষণার কথা বলা হয়।[৭] সিউলে ২০০৫ এ অনুষ্ঠিত "এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পরিবেশ ও উন্নয়ন" শীর্ষক পঞ্চম মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে মন্ত্রী পর্যায়ের ঘোষণা গৃহীত হয়, যেখানে পরিবেশগতভাবে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (সবুজ প্রবৃদ্ধি) অর্জনের কর্মকৌশলের ওপর আলোকপাত করা হয়।

টেকসই উন্নয়নের মূলনীতি

টেকসই উন্নয়ন মূলত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা এমডিজি[৮]-র মতো জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত একটি উন্নয়ন পরিক্রমা, যা ২০১৫ সালের পর এমডিজি-র স্থলে প্রতিস্থাপিত হয়। ৩-১৪ জুন ১৯৯২ ব্রাজিলের রি ও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০-২২ জুন ২০১২ অনুষ্ঠিত হয় রিও+ ২০ (Rio+২০) বা আর্থ সামিট ২০১২ (Earth Summit 2012) সম্মেলন, যার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন বা World Sustainable Development Conferences (WSDC)। এ সম্মেলনে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা Sustainable Development Goals (SDGs)- গ্রহণ করা হয়। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক কনফারেন্স -এ (রিও+ ২০) ৭৯ জন সরকার প্রধানসহ ১৯১ টি জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে। কনফারেন্স-এর ফলাফল সংবলিত দলিল 'দি ফিউচার উই ওয়ান্ট' এ টেকসই উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরা হয়[৯] এবং কিভাবে তা অর্জন করা যায় সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়। ১ জানুয়ারী ২০১৬ থেকে বাস্তবায়ন শুরু হওয়া এসডিজি (SDGs))'র লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ২০৩০ সাল।[১০]

---

৭. UN General Assembly Creates Key Group on Rio+20 Follow-up, *Press Release United Nations Division for Sustainable Development*, https://sustainabledevelopment.un.org/futurewe want.html. retrieved 26 February 2016.

৮. ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত 'সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। ১৭৪ টি দেশ এতে ২০১৫ সালের মধ্যে ৮ টি লক্ষ্য পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যা 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' (Millennium Development Goal-MDG) নামে পরিচিত।

৯. Fan, Shenggen and Polman, Paul. 2014. An ambitious development goal: Ending hunger and under nutrition by 2025. *In 2013 Global food policy report*. Eds. Marble, Andrew and Fritschel, Heidi. Chapter 2. Pp 15-28. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute (IFPRI).

১০. "*Technical report by the Bureau of the United Nations Statistical Commission (UNSC) on the process of the development of an indicator framework for the goals and targets of the post-2015*

২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য পুরোপুরি দূর করা এবং বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য নতুন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের খসড়া রোডম্যাপ ২ আগস্ট, ২০১৫ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। জাতিসংঘের ১৯৩ টি সদস্য দেশ দীর্ঘ তিন বছরের আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে ১৭ টি লক্ষ্য সামনে রেখে ৩০ পৃষ্ঠার এ খসড়া গ্রহণ করে। এর নামকরণ করা হয় Transforming our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development. ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ বিশ্বের শীর্ষ নেতারা চরম দারিদ্র্যমুক্ত, পরিবেশ সুরক্ষিত ও নিরাপদে বসবাসে উপযোগী বিশ্ব তৈরির লক্ষ্যে উপরিউক্ত এজেন্ডা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে।

টেকসই উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য

২০৩০ সালের লক্ষভেদী টেকসই উন্নয়নের রোডম্যাপের প্রধান লক্ষ্য ১৭টি; সূচক ৪৭টি ও সহযোগী লক্ষ্য ১৬৯টি। নিম্নে ১৭ টি লক্ষ্যমাত্রা সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হলোঃ

লক্ষ্যমাত্রা-১ঃ দারিদ্র্যের অবসান (Poverty Allevation) বেকারত্বের মতো দিকগুলো থেকে সমাজের প্রত্যেকের সুরক্ষা, সকলের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। মৌলিক সেবাসমূহ তথা শ্রম, ভূমি, প্রযুক্তিতে স্বল্প পুঁজির লোকদের সম-সুযোগ নিশ্চিতকরণে এবং তাদের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য যেসব সামাজিক নীতিমালা সহায়তা করে সেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বণ্টন নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা-২ঃ ক্ষুধামুক্তি ও খাদ্য নিরাপত্তা (Hunger and Food Security) প্রতিটি শিশুর স্বাস্থ্যকরভাবে বেড়ে উঠার জন্য পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাবারের নিশ্চয়তা, ক্ষুধা দূর করা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পুষ্টি বাড়ানো এবং টেকসই কৃষি পদ্ধতির প্রচলন।

লক্ষ্যমাত্রা-৩ঃ সুস্বাস্থ্য (Good Health and Well-Being)। সব বয়সী মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনমান নিশ্চিত করা এবং মরণঘাতী রোগ থেকে মুক্ত থাকা।

লক্ষ্যমাত্রা-৪ঃ শিক্ষা (Education)। সবার জন্য ন্যায্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সকলের জন্য সব বয়সে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা-৫ঃ লিঙ্গসমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন (Gender Equality and Women's Empowerment)। লিঙ্গসমতা অর্জন এবং সব নারী ও বালিকার ক্ষমতায়ন করা।

---

development agenda - working draft" (PDF). March 2015. Retrieved 1 May 2015.

লক্ষ্যমাত্রা-৬: সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (Water and Sanitation) সবার জন্য পানি ও পয়ঃব্যবস্থার প্রাপ্যতা ও তার টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা-৭: নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানী (Energy)। সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা-৮: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)। সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণকালীন ও উৎপাদনশীল এবং যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

লক্ষ্যমাত্রা-৯: অবকাঠামো ও শিল্পায়ন (Infrastructure, Industrialization) অবকাঠামো নির্মাণ, সবার জন্য ও টেকসই শিল্পায়ন গড়ে তোলা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা-১০: বৈষম্য হ্রাস (Inequality)। দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তদেশীয় বৈষম্য হ্রাস করা, বিশেষ করে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নতির সুফল ভোগের জন্য দরিদ্রদের সহায়তা প্রদান করা।

লক্ষ্যমাত্রা-১১: টেকসই নগর ও সম্প্রদায় (Sustainable cities and communities)। নগর ও মানব বসতির স্থানগুলো সবার জন্য, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করা।

লক্ষ্যমাত্রা-১২: সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার (Sustainable Consumption and Production)। টেকসই ভোগ ও উৎপাদন প্যাটার্ন নিশ্চিত করা ।

লক্ষ্যমাত্রা-১৩: জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ (Climate Change)। জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

লক্ষ্যমাত্রা-১৪: টেকসই মহাসাগর (Sustainable Oceans)। টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা-১৫: ভূমির টেকসই ব্যবহার (Biodiversity, Forests, Deforestation)। ভূপৃষ্ঠের জীবন পৃথিবীর ইকোসিস্টেম সুরক্ষা, পুনর্বহাল করা এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা করা, মরুকরণ রোধ, ভূমিক্ষয়বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন বন্ধ করা

লক্ষ্যমাত্রা-১৬: শান্তি ও ন্যায়বিচার (Peace and Justice)। টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠাকরা, সবার ন্যায়বিচারের সুযোগ নিশ্চিত করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

লক্ষ্যমাত্রা-১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব (Partnership)। লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অংশীদারিত্ব বাস্তবায়ন কৌশলগুলো আরো কার্যকর করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জাগরিত করা।[১১]

জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১)

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) এক সভায় টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ নিরাপত্তা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রথমবারের মতো ১০ বছর মেয়াদি জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (National Sustainable Development Strategy-NSDS) নামের একটি উন্নয়ন দলিল অনুমোদন দেয়া হয়। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রি ও ডি জেনেরিওতে অবস্থিত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন শীর্ষক সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব সদস্য এ ধরনের জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এ কৌশল গ্রহণ করেছে। এ কৌশলপত্রের মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০১০-২০২১ সাল পর্যন্ত। দেশের উন্নয়ন যাতে স্থিতিশীল হয় সে জন্য এ কৌশলপত্র একটি রোডম্যাপ। কৌশলপত্রের মূল লক্ষ্য টেকসই উন্নয়ন। এতে দেশের সব খাতের সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

উৎপাদনশীল সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী টেকসহিতা চ্যালেঞ্জের সমাধানসহ কৌশলপত্রে বিবৃত রূপকল্প অর্জনের জন্য এনএসডিএস (২০১০-২০২১) তিনটি পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত ক্ষেত্রসহ পাঁচটি কৌশলগত অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে। কৌশলগত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অগ্রাধিকারমূলক খাতগুলোর উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। যে তিনটি পারস্পরিকভাবে যুক্ত বিষয়াবলি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকাগুলোর টেকসই উন্নয়নে সহায়তা দান করবে সেগুলো হলো, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু, সুশাসন এবং জেন্ডার। কৌশলগত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য শীর্ষ সংস্থা হিসেবে কাজ করবে টেকসই উন্নয়ন পরিবীক্ষণ পরিষদ (এসডিএমসি)। নিম্নে পারস্পরিক সম্পৃক্ত ক্ষেত্র ও কৌশলগত অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে:

১. অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

পরিবেশগত টেকসহিত্বের প্রশ্নে কোন আপস ছাড়াই মধ্যম আয়ের মর্যাদায় অর্থনীতির রূপান্তরসহ উন্নততর জীবন মান, দ্রুত দারিদ্য নিরসন ও কর্মসৃজন নিশ্চিত

---

[১১] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview.html

করার জন্য ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধিকে প্রধান উন্নয়ন কৌশল হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। অবকাঠামো কর্মসূচি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং তথ্য প্রযুক্তিতে সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং বিনিয়োগ প্রণোদনা বিনিয়োগ-পরিবেশ উন্নয়নসহ পিপিপি প্রবর্ধনে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে, শিক্ষা ও দক্ষতা শিক্ষণের মানসহ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বৈদেশিক কর্ম সংস্থানের প্রসার, জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সবুজ প্রবৃদ্ধি প্রবর্ধনের মাধ্যমে অব্যাহত ও ত্বরান্বিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।

২. অগ্রাধিকারমূলক খাতসমূহের উন্নয়ন

দেশের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারমূলক খাতসমূহের মধ্যে রয়েছে, কৃষি, শিল্প, জ্বালানি, পরিবহন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন। এ খাতগুলোর জন্য সুপারিশকৃত কৌশলে অর্থনীতিকে সঠিক নির্দেশনা দানের উপর জোর দেয়া হয়েছে, কেননা এ খাতগুলোই আগামীতে সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি থাকবে এবং দেশের টেকসই উন্নয়নে সহায়তা দান করবে।

৩. নগর পরিবেশ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে যেহেতু দ্রুত নগরায়ণ অপ্রতিরোধ্য, সুতরাং টেকসই নগর উন্নয়নের ওপর নানাদিক থেকেই দেশের টেকসই উন্নয়ন নির্ভরশীল। এই অংশে নগরাঞ্চলের টেকসই উন্নয়নে পাঁচটি প্রধান বিষয়ে সমাধান অন্বেষণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো, নগর গৃহায়ন, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, দূষণ ব্যবস্থাপনা, নগর পরিবহণ এবং নগর ঝুঁকি হ্রাস।

৪. সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে সকল নাগরিকের অনুকূলে মানসম্মত ও ন্যূনতম মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবার অধিকার এবং সেই সাথে সেবা ও ইউটিলিটি সেবা তাদের জন্য সহজলভ্য করা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, নারীদের অগ্রগতি ও অধিকার, শিশুদের অগ্রগতি ও অধিকার, বয়োবৃদ্ধ এবং অসমর্থ মানুষের জন্য বিশেষ সেবা দান, কর্মসংস্থান সুযোগের বিস্তৃতি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও সুবিধাবলিতে অ্যাকসেস বৃদ্ধি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এগুলো সামাজিক উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। বস্তুত সামাজিক উন্নয়ন টেকসই উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তিসমূহের অন্যতম।

৫. পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

এই কৌশলগত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকার প্রাথমিক উদ্দেশ্যাবলির অন্যতম হলো, প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহারসহ এর সংরক্ষণ ও উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্ব দান সহ

মানব, ইকোসিস্টেম ও সম্পদের জন্য পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ; পানি সম্পদ, বন ও জীববৈচিত্র্য, ভূমি ও মাটি , উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন এর আওতাভুক্ত।

৬. পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এলাকা

জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্রের কৌশলগত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকাগুলোতে সহায়তা দিতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা শনাক্ত করা হয়েছে। পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত এই এলাকাগুলি হলো, সুশাসন, জেন্ডার এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন। এটি প্রতীয়মান হয় যে, জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা উপেক্ষা করে সামগ্রিকভাবে টেকসই উন্নয়ন কখনো অর্জন করা সম্ভব নয়।

৭. সুশাসন

সুশাসন খাতে গহীত কৌশলের উদ্দেশ্য হলো একটি কার্যকর সংসদীয় ব্যবস্থা, উপযুক্ত আইন ও শৃংখলা, গণমুখী ও দক্ষ সরকারি সেবা বিতরণ, স্বাধীন, মুক্ত, স্বচ্ছ, ও জবাবদিহিতামূলক আইন ও বিচার ব্যবস্থা, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার এবং সার্বিকভাবে সমাজিক ন্যায়বিচারসহ একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ নিশ্চিত করা। কৌশলপত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি, প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, দুর্নীতি দমন, পরিকল্পনা ও বাজেটিং-এর দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক খাত পরিবীক্ষন, ই-শাসনের প্রবর্তন, তথ্যে অ্যাকসেস নিশ্চিতকরণ এবং সমাজে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা পুনঃপ্রচলনের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে।

৮. জেন্ডার

জেন্ডারের বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে নারীদের অগ্রগতি ও অধিকার বিষয়ে এই রিপোর্টের সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা অংশে প্রাথমিকভাবে অঙ্গীভূত হয়েছে।[১২]

চিত্র ১-এ এনএসডিএস কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে যাতে পারস্পারিকভাবে সম্পৃক্ত ক্ষেত্র ও কৌশলগত অগ্রাধিকার ক্ষেত্রের অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে।

---

১২. জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১), পৃ. ১৩-২০
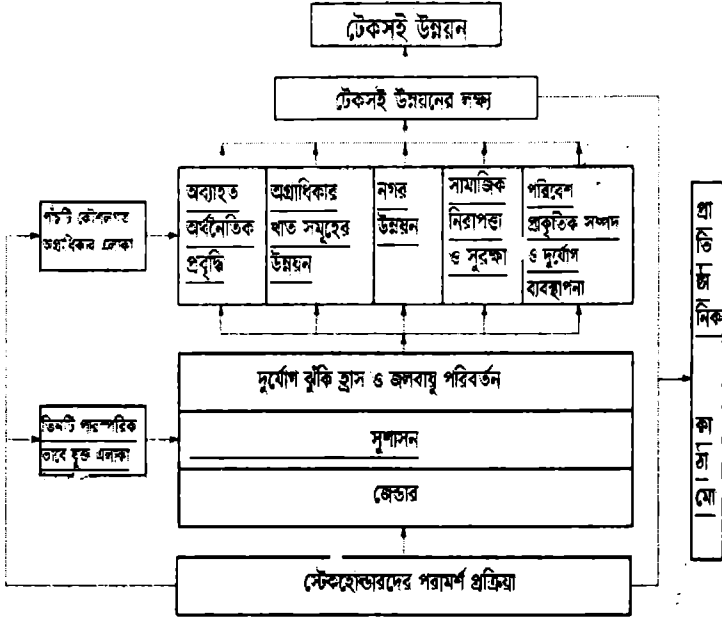
চিত্র-১ : জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল কাঠামোর প্রবাহচিত্র[১৩]

অতএব, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০১০-২০২১ এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে টেকসই উন্নয়নের যেসব মৌলিক দিক ফুটে ওঠে তা হলো:

ক. মৌলিক অধিকার;

খ. পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার;

গ. শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার;

ঘ. বৈষম্য দূরীকরণ;

ঙ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি;

চ. অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন;

ছ. মানবসম্পদ উন্নয়ন।

---

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

ইসলামের দৃষ্টিতে টেকসই উন্নয়ন

ইসলাম মানুষের সব ধরনের চাহিদার ব্যাপারে সার্বিক বা পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে। ফলে ইসলাম টেকসই উন্নয়নকেও তার দৃষ্টিসীমার বাইরে স্থান দেয়নি। ইসলামের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বজগতে মানুষের অবস্থান, এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য এবং দুনিয়ার সুযোগ সুবিধা বা নেয়ামত ভোগ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত। ইসলামী নীতিমালায় সরকার ও সমাজের অর্থনৈতিক আচরণ বা তৎপরতা এবং সামাজিক পরিবেশকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যে, এর ফলে টেকসই ও কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হয়। ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক তৎপরতায় মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ বা বিধানগুলোর ভূমিকা রয়েছে।এ কারণে ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক তৎপরতাগুলো সুস্থ পরিবেশে এবং সঠিক নীতিমালা বা বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

এম খালফান টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করতে যেয়ে বলেন:

> Sustainable development from Islamic perspective seeks to establish a balance between the environment, economic and social dimensions. It means the balance of consumer welfare, economic efficiency, achievement of ecological balance in the framework of evolutionary knowledge-based, and socially interactive model defining the social justice, charity and zakat are two mechanisms to reduce poverty.
>
> টেকসই উন্নয়নকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলে আমরা বুঝতে পারি, ইসলাম পরিবেশ, অর্থনীতি এবং সামাজিক গতিবিধির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, ভোক্তার কল্যাণ, অর্থনৈতিক পর্যাপ্ততা এবং অভিব্যক্তিমূলক জ্ঞান ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার বিভিন্ন মডেল তথা সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র হ্রাসকারী দুটি বিশেষ কৌশল তথা বদান্যতা ও যাকাত ভিত্তিক পরিকাঠামোতে পরিবেশগত ভারসাম্য অর্জন।[১৪]

উন্নয়নের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। মানুষ যেসব সম্পদ ভোগ করে, ইসলামের দৃষ্টিতে তার প্রকৃত মালিক হলেন মহান আল্লাহ। তিনি মানুষকে অন্য সব সৃষ্টির চেয়ে বেশি মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন এবং পৃথিবীর সব কিছু মানুষের আওতাধীন করেছেন, যাতে মানুষ তার প্রতিনিধিত্বের

---

১৪. M. Khalfan, (2002), "Sustainable Development and Sustainable Construction", *A literature Review for C-SanD,* pp1-45.

দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে। এরই আলোকে ইহকাল ও পরকালে মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার আচার-আচরণের প্রকৃতির ওপর। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

আমরা আদম সন্তানদের মর্যাদা দিয়েছি, ভূভাগে ও সাগরে তাঁদের জন্যে পরিবহনের ব্যবস্থা করেছি এবং তাদেরকে পবিত্র জীবিকাসমূহ দিয়েছি এবং আমি অন্য যতকিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের ওপরই আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[১৫]

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ মাত্র, যাতে মানুষ একদিকে তাদের চাহিদাগুলো পুরণ করতে পারে ও এভাবে নিজেকে উন্নত করার সুযোগ পেতে পারে এবং অন্যদিকে তাকওয়া বা খোদাভীরুতা অবলম্বনের মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তিগুলো দমন করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

হে মানবজাতি! জমিনে যা কিছু আছে তা থেকে বৈধ ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং শয়তানের পদক্ষেপের অনুসরণ করো না, কারণ, সে অবশ্যই তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১৬]

ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদাগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ খোলা রেখেছে। কিন্তু ইসলামের কাঙ্ক্ষিত টেকসই উন্নয়ন মানব জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই কিছু নিয়ম কানুন ও নীতিমালা দ্বারা বেষ্টিত। মানুষ যাতে বস্তুগত বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে ছুটতে যেয়ে লোভ-লালসা, অপচয়, জুলুম ও অত্যাচারে জড়িয়ে না পড়ে সে জন্যেই এই সীমারেখা বা সীমাবদ্ধতা রাখা হয়েছে। একজন মানুষের জন্যে দুনিয়া ও এর সম্পদগুলো তখনই অপছন্দনীয়, যখন তা তাকে খোদাদ্রোহিতার দিকে নিয়ে যায় এবং এর ফলে সে অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি ও জুলুমের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়।

টেকসই উন্নয়ন প্রসঙ্গে হাসান যুবায়ের বলেন:

Human beings are God Almightys representatives on the planet Earth, and they are entitled to benefit from its resources without selfishly monopolizing them. Human beings must

---

১৫. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

১৬. আল-কুরআন, ২ : ১৬৮

> seek to develop this planet in accordance with the provisions of the Holy Quran and the teachings of Prophet Muhammad, with the stipulation that current needs must be met without jeopardizing the rights of future generations.
>
> মানব জাতি এই পৃথিবী নামক গ্রহে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সম্পদ একচেটিয়াভাবে ভোগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মানব জাতি অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মুহাম্মদ স.-এর শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমসাময়িক চাহিদা পূরণ করবে এবং উন্নতির চেষ্টা করবে তবে ভবিষ্যত প্রজন্মের কোন অধিকার যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখবে।[১৭]

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন ও জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্রের মূলনীতিসমূহের সাথে ইসলামের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। পূর্বের আলোচনা থেকে টেকসই উন্নয়নের যে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ দিক ফুটে উঠেছে নিম্নে ইসলামের আলোকে তার ব্যাখ্যা বিধৃত হলো:

এক. মৌলিক অধিকার

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মত মানুষের মানবিক মৌলিক অধিকারসমূহের উন্নয়নই টেকসই উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য। টেকসই উন্নয়নের সব মডেলেই মৌলিক অধিকারসমূহকে মূল অনুষঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলাম মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে। মহান আল্লাহ্ মানব জাতির পিতামাতা আদম ও হাওয়া আ.-এর সৃষ্টির পরপরই তাদের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণ করেন এবং তাদের আবাসস্থল হিসেবে জান্নাতকে নির্ধারণ করেন। সেখানে তাদের সব ধরনের প্রয়োজনের প্রাপ্তি ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ - وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴾

> তোমার জন্য এটাই থাকল যে, তুমি সেখানে (জান্নাতে) ক্ষুধার্ত হবে না, নগ্নও হবে না। নিশ্চয় তুমি সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না।[১৮]

ফলে এ ব্যবস্থায় সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ মৌলিক চাহিদা পূরণ করা হয়। নাগরিকদের এ দাবি পূরণকে শাসক তার কর্তব্য মনে করেন। রাষ্ট্রের সকল সদস্য এর দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। আবার ব্যক্তি নিজেও নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকে না। বরং কারো সহযোগিতা

---

১৭. Zubair Hasan, "Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning, Implications and Policy Concern". *JKAU: Islamic Econ.* 19(9): 3-18

১৮. আল-কুরআন, ২০ : ১১৮-১১৯

ছাড়াই নিজের জীবন নির্বাহের চেষ্টা করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মৌলিক অধিকার ও তা অর্জনের পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. দারিদ্র্যের অবসান ও সকলের জন্য খাদ্যের নিশ্চয়তা: জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে যেসব লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে দারিদ্র্যের অবসান ও ক্ষুধামুক্তি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয়। ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য অকল্যাণকর, যা অনেক সময় মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। শয়তান দারিদ্র্যের ভয় দেখিয়ে মানুষকে বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হতে প্ররোচনা দেয়। আল্লাহ বলেন:

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন; আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[১৯]

এ কারণে ইসলাম দারিদ্র্যের অবসানের জন্য বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একদিকে সম্পদ যাতে সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে সীমিত না হয়ে যায় তার জন্য সম্পদের আবর্তনের উপর জোর দেয়[২০], অন্যদিকে সমাজ বা রাষ্ট্রে যাতে কোন প্রকার অসহায় লোক না থাকে তার জন্য ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার নিশ্চিত করে।[২১]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষসহ সকল প্রাণীর খাদ্য গ্রহণের অধিকার রয়েছে। মহান আলস্নাহ এ অধিকার বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করেন। আলস্নাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

আর পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিযক (পৌঁছানোর দায়িত্ব) আল্লাহর ওপর নেই। তিনি জানেন, তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। এ সবকিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে।[২২]

আর্থিক অসঙ্গতি বা অন্য কোনো কারণে কেউ যদি খাদ্য সংগ্রহে অসমর্থ হয়, তবে তাকে সহযোগিতা করা সামার্থ্যবানদের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ স. এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الإِسْلامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

---

১৯. আল-কুরআন, ২ : ২৬৮

২০. আল্লাহর বাণী: كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ "যাতে সম্পদ তোমাদের মধ্যকার ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।" আল-কুরআন, ৫৯ : ৭

২১. আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ "এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।", আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

২২. আল-কুরআন, ১১ : ৬

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স. কে জিজ্ঞাসা করল? ইসলামের মধ্যে সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি বললেন, অপরকে খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিতকে সালাম জানানো।[২৩]

২. সুস্বাস্থ্য: টেকসই উন্নয়নে জাতিসংঘ সব বয়সী মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনমান নিশ্চিত করতে গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলামও মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. মদিনা রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্বারোপ করে স্বাস্থ্য বিভাগ প্রবর্তন করেন। এসময়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন হারিস ইবনে কালাদাহ আসসাকাফী ও আবূ আবী রামসাহ আততামীমী প্রমুখ। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. মুসলমানদেরকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন আজকের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা তা পড়ে অবাক না হয়ে পারে না। মদীনা রাষ্ট্রে গণস্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। রোগীদের দেখাশোনা, সেবা-শুশ্রুষা এবং মৃত ব্যাক্তির দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ ও এসব কাজ সম্পাদন করাকে রাসূলুল্লাহ স. ঈমানী দায়িত্বে পরিণত করেছেন। দেহ সুস্থ এবং আত্মার কল্যাণের জন্য হালাল ও পবিত্র তথা স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। হালাল খাদ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا ﴾

হে মানব ম-লী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর।[২৪]

৩. শিক্ষা: শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ মানব সম্পদে পরিণত হয়। একটি দক্ষ ও উন্নত মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা একটি অপরিহার্য শর্ত। ইসলাম বিদ্যাশিক্ষাকে প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয করে দিয়েছে। শিক্ষিত ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ﴾

তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত বা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। আর বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল শিক্ষা গ্রহণ করে।[২৫]

---

২৩. আল-বুখারি, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ : বাবুল ইতামুত তা'আমে মিনাল ইসলাম, হাদীস নং ১২

২৪. আল-কুরআন, ২ : ১৬৪

২৫. আল-কুরআন, ২ : ২৬৯

৪. সুপেয় পানি: পানির অপর নাম জীবন। সব প্রাণীর জীবনই পানি থেকে তৈরি।[২৬] মহান আল্লাহ সকলের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ - أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ - لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴾

তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরা কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি, তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?[২৭]

ইসলামে পানির অধিকার হলো তার পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করা এবং অপব্যবহার ও অপচয়ের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা।

৫. জীবনের নিরাপত্তা: ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জীবনের নিরাপত্তা পাওয়া তার মৌলিক অধিকার। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা সকল অন্যায় হত্যাকা- হারাম করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾

যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তোমরা তাকে হত্যা করো না। তবে আইনসম্মত হত্যার কথা স্বতন্ত্র।[২৮]

৬. সম্মানের নিরাপত্তা: ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মানুষের মান-সম্মান, সম্ভ্রমের সামগ্রিক নিরাপত্তা বিধান করে। বরং সম্মানের নিরাপত্তাকে তার মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করে। এ কারণে অপরের সম্মানহানি হতে পারে এমন সব কথা ও কাজ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে পরচর্চা, মিথ্যা অপবাদ আরোপ, মন্দ নামে ডাকা, দুর্নাম, দোষারোপ করা। ঘরে ব্যক্তির সাবলীল ও শান্তিপূর্ণ বসবাস নিশ্চিত করার জন্যে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল-কুরআনে এসব বিষয়ে আলোকপাত করে আল্লাহ বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴾

---

২৬. আল্লাহ বলেন: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ "এবং প্রাণযুক্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।" আল-কুরআন, ২১ : ৩০

২৭. আল-কুরআন, ৫৬ : ৬৮-৭০

২৮. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৩

হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেক না। ঈমানের পর মন্দ নাম অতি জঘন্য। যারা তওবা না করে তারাই জালিম। হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বিরত থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চায়? বস্তুত তোমরা তো ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।[২৯]

৭. ধর্ম পালনের স্বাধীনতা: ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির তার নিজের ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে এবং এটি তার মৌলিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾

ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। সত্যপথ মিথ্যা থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে গিয়েছে।[৩০]

দুই. পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার

মানুষ ও পরিবেশ একে অপরের পরিপূরক। কেননা মানুষের আচার ব্যবহার পরিবেশ কর্তৃক প্রভাবিত হয় এবং এর ভিত্তিতে মানুষের জীবন যাত্রার মান পরিচালিত হয়। মানুষ সামাজিক জীব বিধায় একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়, যাতে মানুষ কর্তৃক পরিবেশের কোনরূপ বিপর্যয় না হয়। জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ও জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র পরিবেশ দূষণ রোধ করে এর সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ব্যবহার প্রসংগে নবায়নযোগ্য জ্বালানী, অবকাঠামো ও শিল্প উন্নয়ন, টেকসই নগর ও সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা, ভূমির টেকসহিত্ব ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামও এসব বিষয়ের বিস্তারিত নীতিমালা প্রদান করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনা উলেস্নখ করা হলো:

১. পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তন: মানুষ তার অগ্রযাত্রায় পরিবেশ থেকে নানা উপকরণ গ্রহণ করছে প্রতিনিয়ত। পরিবেশের নানা উপাদানকে মানুষ তার প্রয়োজনে

---

[২৯] আল-কুরআন, ৪৯ : ১১-১২
[৩০] আল-কুরআন, ২ : ২৫৬

যথেচ্ছা ব্যবহার করার ফলে এর বিপর্যয় ও পাশাপাশি জলবায়ুর পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। ইসলাম পরিবেশ দূষণের কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধ করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

স্থলে ও সমুদ্রে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কতিপয় কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।[৩১]

পরিবেশ বিপর্যয় রোধে ইসলাম নীতিমালা নির্ধারণ করেছে, নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

ক. বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধকরণ: পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষায় ও দূষণমুক্ত সবুজ পরিবেশ তৈরিতে বৃক্ষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মহানবী স. পরিবেশ বিপর্যয়রোধে বেশি বেশি বৃক্ষ রোপণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন:

ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة

যদি কোনো মুসলিম একটি বৃক্ষরোপণ করে অথবা কোনো শস্য উৎপাদন করে এবং তা থেকে কোনো মানুষ কিংবা পাখি অথবা পশু ভক্ষণ করে, তবে তা উৎপাদনকারীর জন্য সদকাহ (দান) স্বরূপ গণ্য হবে।[৩২]

খ. পানিতে ও বাতাসের বিপরীতে মলমূত্র ত্যাগ নিষেধ: পানিতে মলমূত্র ত্যাগ পানিকে দূষিত করে, যা পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। এ জন্য ইসলাম বদ্ধ পানিতে মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ করেছে। রাসূলুল্লাহ স. এ সম্পর্কে বলেছেন:

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه

তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে, (কারণ হয়তো) পরে সে ঐ পানিতে উযূ করবে।[৩৩]

একইভাবে ইসলাম বাতাসের বিপরীত দিকেও প্রস্রাব না করার নির্দেশ দিয়েছে। কেননা এর দ্বারা বায়ু দূষণ হয় এবং তা জামা কাপড়ে লাগার উপক্রম হয়।

গ. মৃত জন্তুকে পুঁতে রাখা: মৃত প্রাণী পচে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পরিবেশকে দূষিত করে এক সময় বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত করে। ফলে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী মৃত প্রাণীকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়।[৩৪]

---

৩১. আল-কুরআন, ৩০ : ৪১

৩২. আল বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায় : কিতাবুল হারজে ওয়াল মুযারাত, পরিচ্ছেদ : বাবুল ফাদলে যারই ওয়াল গারজ ইযা আকালা মিনহু, হাদীস নং - ২৩২০

৩৩. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, আস-সুনান, অধ্যায় : কিতাবুত তাহারাত আন রাসুলুল্লাহ স., পরিচ্ছেদ: বাবু মা যাআ ফি কারাহিয়াতুল বাউলে ফিল মাইর রাকিদে, হাদীস নং ৬৮

ঘ. হাঁচির সময় মুখ ঢেকে রাখা: হাঁচির সাথে শরীরের ভিতর থেকে অসংখ্য জীবাণু বের হয়, যার কারণে পরিবেশ দূষিত হয়। বিধায় ইসলাম হাঁচি দেওয়ার সময় মুখ ঢেকে রাখার বিধান প্রবর্তন করেছে।[৩৫]

ঙ. পরিবেশ দূষণ ঈমানের পরিচায়ক নয়: পরিবেশ দূষিত করা ঈমানের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত। কেননা পরিবেশ দূষণকারী এর দ্বারা অন্যকে কষ্ট প্রদান করে এবং নিজেও কষ্ট পায়। অথচ অন্যকে কষ্ট দেয়া মুসলিমের পরিচায়ক নয়।

রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه

সেই প্রকৃত মুসলিম যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।[৩৬]

২. প্রাকৃতিক সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার: অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। টেকসই উন্নয়নের ধারণায় প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর ব্যবহারকে যৌক্তিক সীমার মধ্যে সীমিত রাখা, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকলের অংশগ্রহণ এবং জনগণের সহানুভূতি, ন্যায় বিচার ও ভারসাম্য- এসব বিষয় মৌলিক চাহিদা হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলাম প্রাকৃতিক সম্পদকে

---

৩৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾

"আল্লাহ্ এক কাক প্রেরণ করলেন। সে মাটি খনন করছিল, যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। সে বলল: আফসোস, আমি কি এ কাকের সমতুল্যও হতে পারলাম না যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ আবৃত করি। অতঃপর সে অনুতাপ করতে লাগল।" আল-কুরআন, ৫ : ৩১

৩৫. মহানবী স. বলেন:

إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা হাঁচিকে পছন্দ করেন এবং হাঁই তোলাকে অপছন্দ করেন। অতএব, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দেয়, তোমরা তখন আলহামদুলিল্লাহ্ বলবে, আর যে আল হামদুলিল্লাহ্ শুনবে সে যেন ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে (আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম বর্ষণ করুন)। হাঁই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে, আর যখন তোমাদের কেউ হাঁই তোলে, সে যেন তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কারণ, হাইতোলার উপক্রম হলে শয়তান হাঁসতে থাকে। সূত্র: আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আদাব, পরিচ্ছেদ : ইযা তাসাওবা ফালিয়াদু ইয়াদাহু আলা ফিহে, হাদীস নং ৫৮৭২।

৩৬. আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল ঈমান, পরিচ্ছেদ : আল মুসলিমু মান সালেমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ও ইয়াদিহি, হাদীস নং ১০

যথাযথ প্রক্রিয়ায় এবং অপচয় রোধ করে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছে। নিম্নে এ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা উল্লেখ করা হলো:

ক. মহাসাগর ও পানি: ইসলামের দৃষ্টিতে পানির পরিমাণ সীমিত, তাই এর দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴾

আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণমত, অতঃপর আমি জমীনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম।[৩৭]

খ. ভূমির টেকসহিত্ব: ভূমি মানুষের জীবিকা অর্জন ও উৎপাদনের একটি অপরিহার্য মাধ্যম। ইসলামও ভূমির মালিকানা ও ব্যবহারের বিস্তারিত নীতিমালা উপস্থাপন করেছে। যার মধ্যে পতিত জমি আবাদ করা, জমিতে পানি সেচ ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গ. প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার যথার্থ করার জন্য এতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং এর এক পঞ্চমাংশ সরকারী কোষাগারে জমার বিধান রাখা হয়েছে। একইভাবে ভূমিতে মানুষের ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া হলেও তা থেকে উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিত খাতে ব্যয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তিন: শান্তি নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, সবার ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য জাতিসংঘের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারও গুরুত্বারোপ করেছে। সমাজে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলাম প্রথমত মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত আইনের শাসন প্রয়োগ করে তা বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যাতে শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি শ্লোগান সর্বস্ব না হয়ে অর্থবহ এবং বাস্তব হয়ে ওঠে। ইসলাম ন্যায়বিচারকে উন্নয়নের সহযোগী হিসেবে গণ্য করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করো, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট? আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।[৩৮]

---

৩৭. আল-কুরআন, ২৩ : ১৮

ইসলাম ন্যায়বিচার, সদাচার ও প্রয়োজনীয় বিধান প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়েছে মানুষকে। এ দায়িত্ব পালন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বিচারব্যবস্থায় সর্বোতভাবে সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

এরপর যদি দলটি (আল্লাহর হুকমের দিকে) ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।[৩৯]

ইসলামের ন্যায় বিচারের ধারণা এমন যে ন্যায় বিচারের স্বার্থে পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন এমনকি নিজের বিরুদ্ধেও সত্যের সাক্ষ্য দেয়া অপরিহার্য। মহান আল্লাহ্ বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার অথবা নিকটবর্তী অত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চেয়ে বেশি। অতএব, বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে অবগত।[৪০]

সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছে এবং রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করেছে। অশান্তি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। ইসলাম এমন প্রগতিশীল ব্যবস্থা, যা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে যা কিছু ভালো তার সবই গ্রহণ করে এবং মানবতার জন্য যা কিছু খারাপ ও ক্ষতিকর তার সবই এড়িয়ে যায়। সামজিক শান্তি নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম সকল বিশৃঙ্খলামূলক কাজ নিষিদ্ধ করেছে। অন্যায়ভাবে যারা মানুষকে খুন করে তাদেরকে আইনসংগত ভাবে হত্যা করার বিধান দেওয়া হয়েছে। এমনকি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকে হত্যার চেয়েও জঘন্য হিসেবে ইসলাম অভিহিত করেছে। আল্লাহ্র বিধান দ্বারা উদ্দীপ্ত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পুরোপুরি টেকসই ও কল্যাণকর।

---

৩৮. আল-কুরআন, ৪ : ৫৮
৩৯. আল-কুরআন, ৪৯ : ৯
৪০. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫

চার. বৈষম্য দূরীকরণ

দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তদেশীয় বৈষম্য হ্রাস করা, বিশেষ করে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নতির সুফল ভোগের জন্য জাতিসংঘ দরিদ্রদের সহায়তা প্রদানে গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলাম বিশ্বের সব বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত বৈষম্য দূরীভুত করে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ধনী, গরিব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সাদা, কালো, মুসলিম, অমুসলিম ইত্যাকার কোন পার্থক্য করা হয় না। মানুষ হিসাবে সাধারণভাবে সকলকে সমান মর্যাদা সম্পন্ন মনে করা হয়। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হিসেবে সকল মানুষকে সমঅধিকার সম্পন্ন মনে করা হয়। টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ:

১. লিঙ্গ সমতা: ইসলাম চায় এমন একটি সমাজ তৈরি করতে, যেখানে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ থাকবে এবং সমতার ভিত্তিতে সকলে মৌলিক অধিকার ভোগ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾

মুমিন পুরুষ বা নারী যে কেউ সৎকর্ম করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।[৪১]

২. বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ: ইসলামে বর্ণ বৈষম্য ও বংশের শ্রেষ্ঠত্ব বলতে কিছু নেই। কুরআন মাজীদে মানুষকে একজাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[৪২] মানুষের মধ্যে দেশ, কাল, বর্ণ, ভাষা ও গোত্রের পার্থক্য দূর করে মহানবী স. বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। যেখানে বৈষম্যের লেশও খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، وَلا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلا بِتَقْوَى.

শুধুমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে ছাড়া অনারবগণের উপর আরবগণের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আরবগণের উপরও অনারবগণের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, একইভাবে লালের উপর কালোর ও কালোর উপর লালেরও কোন মর্যাদা নেই।[৪৩]

---

৪১. আল-কুরআন, ৪ : ১২৪

৪২. আল্লাহর বাণী: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ, "হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন। আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

৪৩. আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : কিতাবুল মানাকিব, পরিচ্ছেদ : মান দাওয়াল জাহিলিয়াহ, হাদীস নং, ৪৭

৩. অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ: ইসলাম অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য প্রথমত সম্পদের আবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করে। দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানব গোষ্ঠীকে আর্থিক স্বাবলম্বী তৈরির বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যাকাত, সাদকাহ এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার সাব্যস্ত করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি, বরং উক্ত অধিকার আদায় বাধ্যতামূলক করেছে। এমনকি অভাবগ্রস্তদের সাথে সদাচরণ করারও নির্দেশ দিয়েছে।

পাঁচ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

জীবনের সাথে সম্পদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর এবং নিবিড়। সম্পদ ছাড়া জীবনে সুখ ও নিরাপত্তা কল্পনা করা যায় না। ইসলামে বরং সম্পদ হলো আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নিয়ামত। ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক তৎপরতায় মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধগুলোর বেশ ভূমিকা রয়েছে। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদাগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ খোলা রেখেছে। কিন্তু ইসলামের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে সীমিত। মানুষ যাতে বস্তুগত উন্নয়নের পেছনে ছুটতে গিয়ে লোভ-লালসা, অপচয়, জুলুম ও অত্যাচারে জড়িয়ে না পড়ে সে জন্যই এই সীমাবদ্ধতা রাখা হয়েছে। একজন মানুষের জন্য দুনিয়া ও এর সম্পদগুলো তখনই অপছন্দনীয় যখন তা তাকে খোদাদ্রোহিতার দিকে নিয়ে যায় এবং এর ফলে সে অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি ও জুলুমের অতল গহক্ষরে নিক্ষিপ্ত হয়। ইসলাম মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগানোর বিরোধী নয়। টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্রের আওতায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কৌশলের লক্ষ্য হলো সামাজিক সমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনকে সহজতর করা এবং পরিবেশগত টেকসহিত্বের প্রশ্নে কোন প্রকার আপস না করে অব্যাহত ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা। নিম্নে ইসলামের আলোকে বিষয়টি আলোকপাত করা হলো:

১. যাকাত আদায় করা: ইসলামী সমাজব্যবস্থায় মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। যাকাত সমাজের গরীব-দু:খী মানুষের হক। তা আদায় না করলে ব্যাক্তির নিজস্ব উপার্জিত সম্পদ ভোগ ও হালাল হবে না। এ সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যেক বিত্তশালীর সম্পদে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে আল্লাহ তাআলা যাকাত দান ফরয করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে সাথে রুকু কর।[৪৪]

---

[৪৪] আল-কুরআন, ২ : ৪৩

একইভাবে ইসলাম বিশেষ দান তথা সাদকাহকে কখনো ওয়াজিব এবং কখনো ঐচ্ছিক গণ্য করেছে। এ দু'ধরনের দানই ইসলামী সমাজের অভাব দূর করার ক্ষেত্রে বাস্তব ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴾

আর আল্লাহ্‌র ভালবাসায় নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদেরকে সম্পদ দান করে।[৪৫]

২. অপচয়-অপব্যয় নিষিদ্ধ: মানুষ তাঁর প্রয়োজনে অর্থ উপার্জন করবে, ব্যয়ও করবে। তবে কোন ক্রমেই অপচয় করতে পারবে না। মানুষের অর্থনৈতিক দায়িত্ব হলো সে অর্থের অপচয় রোধ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করবে, আহার করবে, পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।[৪৬]

৩. অভাবী ও দরিদ্রের দান করা: সমাজের সম্পদশালী মানুষের প্রধান দায়িত্ব হলো তারা তাদের সম্পদের উদ্বৃত্ত অভাবী ও দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করবে। এটা গরীবদের প্রতি তাদের অনুগ্রহ নয় বরং অবশ্য পালনীয় দায়িত্বমাত্র। ধনীদের সম্পদ গরীবদের অধিকার ঘোষণা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

এবং তাদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক।[৪৭]

৪. সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা: মানুষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসহনীয় বৈষম্য দূর করার জন্য সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করবে। সুষম বন্টনের জন্যে আল কুরআনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এভাবে:

﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

---

৪৫. আল-কুরআন, ২ : ১৭৭
৪৬. আল-কুরআন, ৭ : ৩১
৪৭. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

আল্লাহ জনপদের অধিবাসীদের নিকট হতে তার রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তার রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূলুল্লাহ স. তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তো শাস্তি দেওয়ায় কঠোর।[৪৮]

৫. সুদ বর্জন করা: সমাজ ব্যবস্থায় সুদ একটি অভিশপ্ত পদ্ধতি। এটি শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এতে করে সামগ্রিক স্বার্থ নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়। ফলে ইসলাম সুদকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করে। এ ব্যবস্থায় কেউ সুদ দিতেও পারবে না এবং নিতেও পারবে না, এতে মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ তা'আলা কোনো পাপী কাফিরকে ভালবাসেন না।[৪৯]

তিনি আরও বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যিই যদি মুমিন হয়ে থাক তবে সুদের বকেয়া ছেড়ে দাও।[৫০]

সুদে কোন সময়ই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয় না, আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾

মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকে আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায়।[৫১]

৬. অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ নিষিদ্ধ: ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কারও জন্য অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় হারাম করা হয়েছে। কেউ কারো সম্পদ

---

৪৮. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭
৪৯. আল-কুরআন, ২ : ২৭৬
৫০. আল-কুরআন, ২ : ২৭৮
৫১. আল-কুরআন, ৩০ : ৩৯

অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ না করলে সম্পদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয় না, ফলে তা গাণিতিক হারে প্রবৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

মুমিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।[৫২]

৭. সম্পদে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি: যে কোন ব্যক্তি হালাল পথে সম্পদ উপার্জন করে তার মালিক হতে পারে এবং স্বাধীনভাবে সে সম্পদ ভোগ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾

পুরুষ যা অর্জন করবে সে তা থেকে অংশ পাবে এবং নারী যা অর্জন করবে সে তা থেকে অংশ পাবে।[৫৩]

ছয়. অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন

জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অংশীদারিত্ব বাস্তবায়নের উপায়গুলো আরো কার্যকর করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জাগরিত করার ব্যপারে উৎসাহিত করেছে। বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেসব ব্যক্তি ও সংস্থা অনেকদিন ধরে কাজ করছে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা। লক্ষ্যমাত্রাগুলো পূরণের ক্ষেত্রে এসব ব্যক্তি ও সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা উচিত, কারণ তাদের অভিজ্ঞতা ও সহায়তা এ কাজে আবশ্যক। ইসলামও জ্ঞানীজন থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করে। আল্লাহ বলেন:

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾

যদি তোমরা না জান তবে জ্ঞানীদের থেকে জেনে নাও।[৫৪]

এ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা নিম্নরূপ:

১. পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ: ইসলামে মানুষের অন্যতম প্রধান সামাজিক দায়িত্ব হলো মানুষের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং

---

৫২. আল-কুরআন, ৪ : ২৯
৫৩. আল-কুরআন, ৪ : ৩২
৫৪. আল-কুরআন, ১৬ : ৪৩, ২১ : ৭

পারস্পরিক সুসম্পর্ক সংরক্ষণে বিস্তারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সমাজে মানুষের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপনের অনুপ্রেরণা যোগায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾

মুমিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই।[৫৫]

২. অধীনস্তদের সাথে সদাচরণ করা: অধীনস্ত কর্মচারী, দাস-দাসীরা সাধারণত মানুষের মতোই মানুষ। তাদেরকে মর্যাদা দেয়া, তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা মানুষের অন্যতম দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾

মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত এবং নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।[৫৬] অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়নে কর্মীর প্রতি সদাচার এর কোন বিকল্প নেই।

৩. কল্যাণকর কাজে অংশীদারিত্ব: ইসলাম সব কাজে অংশীদারিত্বকে সমর্থন করে না। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে কল্যাণকর কাজে অংশীদারিত্ব ইসলামে স্বীকৃত। বরং এসব কাজে পরস্পরের সহযোগিতাই কাম্য আল্লাহ বলেন:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

তোমরা তাকওয়া ও পুণ্যের কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না।[৫৭]

সাত: মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠী একটি বিশাল সম্পদে পরিণত হতে পারে। মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে একটি মানবগোষ্ঠীর সুপ্ত প্রতিভা, প্রচ্ছন্ন শক্তি, লুকায়িত সামর্থ্য, যোগ্যতার প্রসার ঘটে। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সহ দারিদ্র নিরসন ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি শিক্ষিত, সুপ্রশিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান জনগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি মানব গোষ্ঠীর উন্নতি ঘটে চারটি বস্তুর সমন্বয়ে আর সেগুলো হলো,

---

৫৫. আল-কুরআন, ৪৯ : ১০

৫৬. আল-কুরআন, ৪ : ৩৬

৫৭. আল-কুরআন, ৫ : ২

শিক্ষা-কর্মদক্ষতা, দক্ষতা অনুযায়ী কর্ম-সম্পাদন, কর্মক্ষমতা সৃষ্টি এবং ইতিবাচক কর্মস্পৃহা।[৫৮] উপরোক্ত বিষয়াবলি একটি মানুষের ভিতর তখনই বাস্তবায়ন হবে, যখন তার ভিতর শিক্ষা, নৈতিকতা, স্বাস্থ্য ও কর্মপ্রেরণার বিকাশ ঘটবে। এই চারটি বিষয়কে রক্ষা করার ব্যাপারে ইসলাম বিশেষভাবে জোর তাগিদ প্রদান করেছে।

টেকসই উন্নয়নের সাধারণ ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা

পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে টেকসই উন্নয়ন বলতে কেবল ভোগ ও মুনাফা অর্জনকেই বোঝায়। পাশ্চাত্য রেনেসাঁর পর ভোগবাদী ও মুনাফাকামী নীতি গ্রহণ করে এবং মানুষকে চরম ভোগবাদী হতে উৎসাহ দেয়া হয়। এ বিষয়টি অর্থনৈতিক তৎপরতায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। পাশ্চাত্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের বৈষয়িক চাহিদাগুলো মেটানোর ক্ষেত্রে চরমপন্থা গৃহীত হওয়ায় ভোগবাদ লাগামহীনভাবে বেড়েছে। এর ফলে অনেক কৃত্রিম বা অপ্রয়োজনীয় চাহিদাও সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই চরমপন্থা বা বাড়াবাড়ি বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে। পাশ্চাত্যের টেকসই উন্নয়ন মডেলে যান্ত্রিকতাবাদ বা মেশিনিজমের মোকাবেলায় মানুষের মর্যাদা ও ইচ্ছাকে গুরুত দেয়া হয়নি। এটাই টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে পশ্চিমা উন্নয়ন মডেলের প্রধান বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। ইসলামে টেকসই উন্নয়নকে নৈতিকতার সাথে সমন্বিত করা হয়েছে। ফলে ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক তৎপরতাগুলো হয় লক্ষ্যপূর্ণ ও যৌক্তিক। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ধনসম্পদ বা ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন তৎপরতা যেন মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কে উদাসীন না করে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾

> এরা সেইসব লোক যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামাজ কায়েম ও যাকাত দান হতে বিরত রাখতে পারে না। তাঁরা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।[৫৯]

এ আয়াতে এমন লোকদের ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাদের বৈধ বা ইতিবাচক অর্থনৈতিক তৎপরতা তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না। এটা স্পষ্ট যে, যারা মহান আল্লাহকে সব সময় স্মরণ রাখে তারা অর্থনৈতিক তৎপরতাসহ যে কোনো কাজেই জুলুম, প্রতারণা এবং দুর্নীতি থেকে দূরে থাকে। এ ধরনের লোকদের জন্যে সব সময় সৌভাগ্য বা সুফল অপেক্ষা করে।

---

৫৮. সুকেশ চন্দ্র জোয়ারদার, *বাংলাদেশের অর্থনীতি* (ঢাকা, মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ২০০৯), পৃ. ৪১২

৫৯. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৭

উপসংহার

পরিবেশের কোন ভৌগলিক সীমারেখা নেই এবং কোনো দেশই বিচ্ছিন্নভাবে নিজ পরিবেশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে এককভাবে নিজের ভবিষ্যৎকে শঙ্কামুক্ত করতে পারে না। এজন্য টেকসই উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের অংশীদারিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কারণে ইসলামের ন্যায়বিচার, নৈতিকতা, সাম্য, সৌন্দর্যবোধ, ভালবাসা, দেশপ্রেম প্রভৃতি মূল্যবোধ বাস্তবায়নের উপর জোর দিতে হবে। কেননা এই মূল্যবোধ হারিয়ে যাওয়ার কারণেই উন্নয়নের মানবিক অবয়ব আজ ধুলা মলিন হয়ে গেছে। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে দেশের মানব উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সক্রিয়তা প্রয়োজন। এছাড়া প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও পরিকল্পনা কমিশনের সক্রিয় কার্যক্রমের মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো জরুরী। ইসলাম এ বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। তাই বলা যায়, টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়িত হলে জাতি পেতে পারে উন্নয়নের স্থায়ী সুফল ও সমৃদ্ধি।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭
জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬

ওয়াকফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ও ওয়াকফ আইন ২০১৩ : একটি পর্যালোচনা

আবদুস সুবহান আযহারী*

Waqf Ordinance 1962 and Waqf Law 2013: A review

ABSTRACT

Waqf is seen as an instance of a virtuous deed. In Islam, waqf is not just seen as a permissible practice, but a praiseworthy virtuous act as well through which one can dedicate their savings in their chosen field in order to gain the satisfaction of Allah and also align their aim in life towards helping others and again Allah's satisfaction as a result. This article will discuss the concept of waqf in the view of Islam, its importance, the various forms of waqf during the different ages, the guidelines, the conditions, and give a review of waqf ordinance 1962 and waqf law 2013. The paper has been prepared following descriptive and analytical approaches. This paper proves that Islam is ahead of any other ideology in the aspect of human welfare. The achievement of human welfare is the main aim behind the directives and rulings of Islam. This is also the reason behind the directives and rulings of waqf.

Keywords: Waqf; Mutawalli; Waqf ordinance 1962; Waqf Law 2013.

সারসংক্ষেপ

ওয়াক্ফ পুণ্যলাভের একটি উপায়। ইসলামে ওয়াক্ফ কেবল বৈধ রীতিই নয়, বরং এমন এক প্রশংসনীয় পুণ্যের কাজ, যার দ্বারা নিজের প্রিয় সঞ্চয়কে নিজের পছন্দনীয় কাজে ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিয়োজিত করা হয় এবং সেবার এ ধারায় জীবনের পরম লক্ষ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করা যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াকফ, এর গুরুত্ব, বিভিন্ন যুগে এর ধরন, নীতিমালা, শর্তাবলি, ওয়াকফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ও ওয়াকফ আইন ২০১৩ এর পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। গবেষণা কর্মটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনা ও পর্যালোচনামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানব কল্যাণের

---

* এমফিল গবেষক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

ক্ষেত্রে ইসলাম যে কোন মতাদর্শ থেকে অগ্রগামী। মানবতার কল্যাণ সাধনই ইসলামী বিধি-বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় ওয়াকফ সংক্রান্ত বিধান প্রণীত হয়েছে।

মূলশব্দ: ওয়াকফ; মোতাওয়াল্লী; ওয়াকফ অধ্যাদেশ ১৯৬২; ওয়াকফ আইন ২০১৩।

ওয়াক্‌ফ-এর পরিচয়

ওয়াকফের শাব্দিক অর্থ হল, কোন জিনিসকে আবদ্ধ রাখা, আটকে রাখা এবং দান করা ইত্যাদি।[১] আর শরীয়তের পরিভাষায় ওয়াকফের সংজ্ঞায় আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা বর্ণনা করা হলো:

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে:

حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة

কোন বস্তুকে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায় রেখে এর উপযোগকে দান করা।[২]

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে, কোন বস্তুকে আল্লাহর মালিকানায় এমনভাবে দিয়ে দেয়া যে, এর উৎপাদন ও উপযোগ বান্দাদের নিকটই প্রত্যানীত হবে অর্থাৎ এর উৎপাদন ও উপযোগ দ্বারা তারাই উপকৃত হবে। তাঁদের মতে ওয়াক্‌ফ সম্পাদন করার সাথে সাথেই তা অপরিহার্য হয়ে যায়। কাজেই তা আর বিক্রয় করা যায় না, হেবা করা যায় না এবং উত্তরাধিকার হিসাবেও বন্টন করা যায় না।[৩]

একদল আলিম সংক্ষিপ্তসারে ওয়াকফ-এর সংজ্ঞায় বলেন:

تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة

মূল সম্পদ নিয়ন্ত্রণে রেখে এর ফল (উপকারিতা) উৎসর্গ করা।[৪]

ওয়াকফ-এর এ সংজ্ঞাটি অন্যান্য সংজ্ঞা থেকে ব্যাপক; এতে ওয়াকফ আবশ্যক নাকি শুধুমাত্র বৈধ? ওয়াকফকৃত সম্পদের মালিকানা কার? ইত্যাকার প্রশ্নসহ ওয়াকফ সংশ্লিষ্ট গৌণ বিধি-বিধানের ব্যাপারে মতভেদ তৈরির সুযোগ থাকে না। এ কারণে আমরা ওয়াকফ-এর সংজ্ঞা হিসেবে এটিকে প্রাধান্য দিতে পারি। এ প্রাধান্যের পিছনে যুক্তিসমূহ নিম্নরূপ:

---

১. সাইয়্যিদ আমীর আলী, *আইনুল হিদায়া* (লাহোর: কানূনী কুতুবখানা, তারিখ বিহীন), খ. ২, পৃ. ২৪১

২. দামাদ আফিনদী, *মাজমাউল আনহুর* (বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তারিখবিহীন), খ. ১, পৃ. ৭৩১

৩. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাস আল-আরাবী, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৩৫০

৪. মানসূর ইবন ইউনূস আল-বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা'* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৪০; আহমদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী ফী শারহি সহীহিল বুখারী* (বৈরূত: মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ২০০৯খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৮০; ইমাম শামসুদ্দিন আস সারাখসী, *আল মাবসূত* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফা, ১৯৭৮), খ. ১২, পৃ. ২৭

ক. এ সংজ্ঞাটি ওয়াকফ-এর মূলনীতি সম্পর্কে মহানবী স.-এর বাণীর হুবহু প্রতিধ্বনি। উমার রা-এর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

তুমি ইচ্ছা করলে জমিটি ওয়াকফ করে তার উৎপন্ন ফসল সাদকা করতে পার।[৫]

খ. সংজ্ঞায় ওয়াকফ-এর প্রকৃত প্রকৃতি তুলে ধরা হয়েছে। যাতে মতপার্থক্য করার সুযোগ নেই।

গ. সংজ্ঞায় বর্ণিত দুটি বিষয় তথা 'সম্পদের নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষণ' ও 'এর উপযোগিতা দান করা' সম্পর্কে আলিমগণ ঐকমত্য পেশ করেছেন। কেননা ইসলামী আইন প্রণেতাগণ ওয়াকফের সংজ্ঞায় এ ব্যাপারটি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন যে, ওয়াকফকৃত সম্পদে উপকারভোগী কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তার থেকে শুধু উপকার ভোগ করতে পারবে। কেননা মূল সম্পদের উপর কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ জায়েয নেই, এই জন্য তা বিক্রিও করা যায় না, বন্ধকও রাখা যায় না, হেবা করা যায় না বা মিরাছের ভিত্তিতে বণ্টনও করা যায় না।[৬]

ওয়াক্ফ-এর বৈশিষ্ট্য

ওয়াকফ একটি দান বিশেষ। তবে এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা একে অন্যান্য দান থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। ওয়াক্ফ-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. একটি উৎসর্গ;
২. এটা একটি স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির উৎসর্গ;
৩. এ উৎসর্গ এমন উদ্দেশ্যে যা ইসলামী আইনে পুণ্যজনক, ধর্মীয় ও দাতব্য বলে স্বীকৃত;
৪. উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যে গ্রান্ট বা অনুদানও এর অন্তর্ভুক্ত;
৫. এর ক্ষেত্র ও পরিসর ব্যাপক। কেননা এর উপকারভোগী শুধুমাত্র দরিদ্র শ্রেণী নয়;
৬. এর উপযোগিতা ও প্রতিদান চলমান;
৭. উপকারভোগীর হস্তক্ষেপমুক্ত;
৮. মুসলিম বা অমুসলিম যে কেউ ওয়াক্ফ সৃষ্টি করতে পারে।[৭]

---

৫. হাদীসটির পূর্ণ বিবরণ ও সূত্র পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে।

৬. আবূ যাহরা, *মুহাযারাত ফির ওয়াকফ* (কায়রো: দারুল ফিকির আল আরবী, ১৯৭৬), পৃ. ৩৯

৭. খায়রুদ্দীন তালিব, "খাসাইসুল ওয়াকফ ফীশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ", *মাজাল্লাতুল জামিয়া আল-আরাবিয়্যাহ আল-আমরিকিয়্যাহ লিলবুহুছ,* খ. ১, সংখ্যা ১, পৃ. ৩০-৪০; গাজী শামছুর রহমান, *ওয়াক্ফ আইনের ভাষ্য* (ঢাকা: ঢাকা ল' বুক হাউজ, ১৯৮৮), পৃ. ১১

ওয়াকফের গুরুত্ব

ওয়াকফ পুণ্য লাভের একটি সুন্দরতম উপায়। ইসলামে এটা কেবল বৈধ রীতিই নয়; বরং একটি প্রশংসনীয় কাজ। ইসলাম একাজে উৎসাহ প্রদান করে। ওয়াকফ এমন একটি পুণ্যের কাজ, যা দ্বারা নিজের প্রিয় সঞ্চয়কে নিজের পছন্দনীয় কাজে ও আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত করা হয় এবং সেবার এ ধারায় জীবনের পরম লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করা যায়। ওয়াকফ হচ্ছে সমাজসেবা ও জনকল্যাণের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। দাতা ইনতিকালের পরও তার সে দান মানবতার কল্যাণে বহাল থাকে। নবী করীম সা. ইরশাদ করেন:

> إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه.
>
> মানুষ মারা যাওয়ার পর তিনটি ছাড়া তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। ঐ তিনটি বিষয় হলো, সাদকায়ে জারিয়া, যে ইলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।[৮]

ইসলাম পূর্বযুগে ওয়াকফ

ইসলাম পূর্ব যুগেও ওয়াকফের প্রমাণ পাওয়া যায়, যদিও বাহ্যত তাকে ওয়াকফ নামকরণ করা হয়নি। এর প্রমাণ হল, পূর্বযুগেও বিভিন্ন উপাসনালয় বিদ্যমান ছিল, সেগুলোর একক কোন মালিকানা ছিল না। ওয়াকফের প্রতিরূপই তার মাঝে প্রতিফলিত হয়।

আদিম যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ের সাথে সাথে স্বয়ং মসজিদ ওয়াকফ হওয়ার বিষয়টিও দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন বাইতুল্লাহ ও মসজিদে আকসার অস্তিত্ব এক বাস্তব সত্য বিষয়।

ঐ সমস্ত পবিত্র স্থানের ভোগ ব্যবহারের অধিকার একক কোন ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত ছিল না; বরং সকল মানুষই তাতে শরীক ছিল। সুতরাং একথা বলা অর্থহীন হবে না যে, ওয়াকফের অস্তিত্ব সেগুলোর মাঝে বিদ্যমান ছিল।

মুহাম্মদ আবু যাহরা [১৮৮৯-১৯৭৪খ্রি.] ওয়াকফের পর্যালোচনা করে লিখেছেন, ইসলাম ওয়াকফকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে তার মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি করেছে। আর ওয়াকফকে শুধু উপাসনালয় ও মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং ওয়াকফ সম্পত্তি দরিদ্রদের জন্যও হতে পারে এবং করজে হাসানার জন্যও ব্যয় করা যায়।[৯]

---

৮. আবূ ঈসা আত তিরমিযী, *জামে তিরমিযী*, খ. ১, পৃ. ১৬৫ দেওবন্দ, ভারত

৯. মুহাম্মাদ গোলাম আবদুল হক, *আহকামে ওয়াকফ*, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, পৃ. ২৪

মহানবী স. -এর যুগে ওয়াকফ

এ সম্পর্কে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য উমর রা.-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি:

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর রা. খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ স. এর কাছে এসে বললেন, আমি এমন ভাল একটি জমি পেয়েছি যা ইতঃপূর্বে কখনো পাইনি। আপনি এ সম্পর্কে আমাকে কি নির্দেশ দেন? রসূলুল্লাহ স. বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে জমিটি ওয়াকফ করে তার উৎপন্ন ফসল সাদকা করতে পার। উমর রা. এটি গরীব, আত্মীয় স্বজন, গোলাম আযাদ, আল্লাহর পথে, মেহমান ও মুসাফিরদের জন্য এ শর্তে সাদকা করলেন যে, আসল জমি বিক্রি করা যাবে না, কাউকে দান করা যাবে না, কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না। তবে যে এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য তা থেকে সংগত পরিমাণ খেতে বা বন্ধু বান্ধবকে খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই, তবে এথেকে সঞ্চয় করবে না।[১০]

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. যখন মদীনায় এলেন তখন মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন এবং তিনি বললেন, হে বানু নাজ্জার! মূল্য নির্ধারিত করে তোমাদের এ বাগানটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তারা বলল, এরূপ নয়, আল্লাহর কসম! একমাত্র আল্লাহর কাছেই আমরা এর মূল্যের আশা রাখি।[১১]

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। উমর রা. এক ব্যক্তিকে তার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেন, যেটি রসূলুল্লাহ স. তাকে আরোহণের জন্য দিয়েছিলেন। উমর রা. কে জানানো হলো যে, ঘোড়াটি সেই ব্যক্তি বিক্রির জন্য রেখে দিয়েছে। তিনি রসূলুল্লাহ স. কে তা ক্রয় করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তরে রসূলুল্লাহ স. বললেন, তুমি তা ক্রয় করবে না এবং যা সাদকা করে দিয়েছে তা আর ফিরিয়ে নিবে না।[১২]

---

১০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী, *আল-জামি' আস-সহীহ*, (ঢাকা: হামিদিয়া লাইবেরী), খ. ১, পৃ. ৩৮৮

১১. সহীহ আল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৭

...حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه : لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة أمر بالمسجد وقال (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا) . قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله

১২. বুখারী, *আসসাহীহ*, অধ্যায়: আল-ওয়াসাইয়া, হা. নং: ২৬২৩

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه و سلم ليحمل عليها رجلا فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبتاعها فقال (لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك)

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ স. বলেন:

لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة

আমার উত্তরাধিকারীরা কোন স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রা ভাগাভাগি করবে না। বরং আমি যা কিছু রেখে গেলাম তা থেকে আমার সহধর্মিণীদের খরচ এবং কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সাদকা রূপে বিবেচিত হবে।[১৩]

ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি

ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু ওয়াক্‌ফকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট, কিছু সম্পর্কিত ওয়াক্‌ফ কর্মের সাথে এবং কিছুর সম্পর্ক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সাথে।

ওয়াক্‌ফকারীর সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি

১. ওয়াক্‌ফকারীকে প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানবান ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে।
২. ওয়াক্‌ফকারী ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হবে। ওয়াক্‌ফ সহীহ হওয়ার জন্য ওয়াক্‌ফকারী মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং কোন অমুসলিম যদি বিধি মোতাবেক ওয়াক্‌ফ করে তবে তা বৈধ হবে।
৩. তার মধ্যে সম্পদ দানকারীর গুণাবলি[১৪] থাকতে হবে।[১৫]

ওয়াক্‌ফ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি

১. ইসলাম অনুমোদিত পুণ্যকর্মের জন্য ওয়াক্‌ফ করতে এবং তার ঘোষণা দিতে হবে। যেমন মসজিদ, মাদরাসা, রাস্তাঘাট, সরাইখানা ইত্যাদি।
২. ওয়াক্‌ফ তৎক্ষণাৎ কার্যকর করতে হবে এবং কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। যেমন অমুক ব্যক্তি যদি আসে তবে আমার এ জমি ওয়াক্‌ফ ।[১৬]
৩. ওয়াক্‌ফকালে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রয় করে তার অর্থ নিজ ইচ্ছেমত ব্যয় করার শর্ত আরোপ করা যাবে না। যেমন কেউ বলল, আমি এ জমি এই শর্তে ওয়াক্‌ফ করছি যে, যখন ইচ্ছা আমি এটা বিক্রয় করে এর অর্থ নিজ কাজে খরচ করতে বা দান সদকা করতে পারব। এরূপ শর্ত আরোপ করলে 'ওয়াক্‌ফ' সহীহ হবে না। তবে মসজিদের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন অর্থাৎ মসজিদের জন্য এরূপ শর্ত সাপেক্ষে ওয়াক্‌ফ করলে ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে এবং শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।[১৭]

---

১৩. বুখারী, *আসসাহীহ,* অধ্যায়: আল-ওয়াসাইয়া, হা. নং: ২৬২৪

১৪. দানকারীর গুণাবলির মধ্যে রয়েছে: মুকাল্লাফ হওয়া, স্বাধীন হওয়া, স্বেচ্ছায় দানকারী হওয়া, নির্বোধ বা বোকা না হওয়া ইত্যাদি। বিস্তারিত দ্র. *আল-মাওসুয়্যাহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ* (কুয়েত: আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৯ম সংস্করণ, ১৪২৭হি.), খ. ৪৪, পৃ. ১২৪

১৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত

১৬. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী,* খ. ২, পৃ. ৩৫২

১৭. প্রাগুক্ত

৪. ওয়াক্‌ফকালে বিবেচনার জন্য সময় হাতে রাখা যাবে না। যেমন কেউ বলল, আমি এ জমি এই শর্তে ওয়াক্‌ফ করছি যে, তিনদিন বিবেচনা করে দেখব এবং ইচ্ছে হলে এ সময়ের মধ্যে প্রত্যাহার করতে পারব। এরূপ শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্‌ফ সহীহ হবে না। তবে মসজিদের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন অর্থাৎ মসজিদের জন্য এরূপ শর্ত সাপেক্ষে ওয়াক্‌ফ করলে ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে এবং শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

৫. ওয়াক্‌ফ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা যাবে না। কাজেই নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য ওয়াক্‌ফ করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। অবশ্য স্থায়িত্বের বিষয়টি মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়।[১৮]

৬. নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা তার বংশধরের জন্য ওয়াক্‌ফ করলে তা বৈধ হবে না। কেননা এক সময় তাদের শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ ওয়াক্‌ফ স্থায়ীভাবে হওয়া শর্ত। সুতরাং ওয়াক্‌ফ করতে হবে এমন খাতে যা স্থায়ী হয়। যেমন সাধারণভাবে দরিদ্রদের জন্য, মসজিদের জন্য ইত্যাদি।

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি

১. ওয়াক্‌ফ করার সময় ওয়াক্‌ফ-এর বস্তুতে দাতার মালিকানা থাকা শর্ত। কাজেই জোরপূর্বক দখলকৃত জমির ওয়াক্‌ফ বৈধ নয়, এমনকি পরবর্তীতে তা কিনে মূল্য পরিশোধ করলেও পূর্বের ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে না।[১৯] তবে অন্যের মালিকানাধীন বস্তু তার অনুমতি ব্যতীত যদি ওয়াক্‌ফ করে এবং পরবর্তীতে প্রকৃত মালিক তা অনুমোদন করে তবে ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে।[২০]

২. ওয়াক্‌ফকৃত বস্তুর পরিমাণ ও অবস্থান সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন কেউ বলল, আমি আমার জমি থেকে ওয়াক্‌ফ করলাম, কিন্তু কোথাকার কতটুকু জমি তা উল্লেখ করল না, এরূপ ওয়াক্‌ফ বৈধ হবে না। তবে কোন সুপ্রসিদ্ধ জমি বা বাড়ি, যা সকলেই চেনে তার পরিমাণ বা সীমারেখা উল্লেখ না করলেও ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে।

৩. ওয়াক্‌ফ বৈধ হবার উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে, ওয়াক্‌ফ স্থাবর সম্পত্তি হতে হবে। তবে যুদ্ধের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যতিক্রম। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ রা. সহ আরও বহু সাহাবী যুদ্ধ সামগ্রী ওয়াক্‌ফ করেছিলেন এবং মহানবী স. তা অনুমোদন করেছিলেন।[২১] এ পরিপ্রেক্ষিতে অনেক আলিম ক্যাশ ওয়াকফকেও এ বিধানের আওতাভুক্ত করেন।

---

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৬

১৯. কামালউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে হুমাম, *শরহে ফাতহুল কাদীর লিল আজিযিল ফাকীর* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল আলামিয়্যাহ, তা.বি), খ. ৫, পৃ. ৪১৭

২০. প্রাগুক্ত

২১. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, পৃ. ৩৫৭

ওয়াক্ফ করার নিয়ম

নির্দিষ্ট কিছু শব্দ দ্বারা ওয়াক্ফ সংঘটিত হয়। যেমন–
ওয়াক্ফ-এর ভাষায় বা ওয়াক্ফকারীর নিয়তে এটা পরিষ্কার থাকতে হবে যে, সে যে সকল বস্তু ওয়াক্ফ করছে তা সংরক্ষিত রাখা হবে। সেই সঙ্গে উপরে বর্ণিত শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন কোন শর্ত বা শব্দ যুক্ত করা যাবে না, যদ্বারা উক্ত শর্তসমূহ লঙ্ঘিত হয়।

ওয়াক্ফ লিখিতভাবে করা যেতে পারে, আবার মৌখিকভাবেও করা যেতে পারে। তথাপি এর জন্য সাধারণত লিখিত দলীল সম্পাদন করা হয়। দাতা দান বা ওয়াকফ বোঝায় এমন শব্দের মাধ্যমে স্বীয় ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে। অথবা সে অন্য ভাষা অবলম্বন করলে তার সাথে সংযোগ করবে 'তা বিক্রি করা, দান করা, অথবা ওয়াসিয়ত করা যাবে না।[২২]

ওয়াক্ফকৃত মূল সম্পত্তি সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হলে কিংবা স্থায়ীভাবে চলতে পারে সেভাবে ওয়াক্ফ করা না হলে ওয়াক্ফ বলে গণ্য হবে না।[২৩]

ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লীর গুণাবলি

ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লীর জন্য ফকীহগণ নিম্নোক্ত গুণাবলী নির্ধারণ করেছেন:

১. সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া;
২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া;
৩. বিশ্বস্ত হওয়া;
৪. তত্ত্বাবধান কার্য পালনে সক্ষম হওয়া;
৫. মুসলমান হওয়া[২৪]

মুতাওয়াল্লীর ক্ষমতা

ওয়াকফকারী নিজেই ওয়াকফকৃত সম্পদের মুতাওয়াল্লী হওয়া জায়িয। এটি যাহিরী মাযহাব। ওয়াকফকারী নিজে মুতাওয়াল্লী হওয়ার শর্ত না করলে, সে মুতাওয়াল্লী হবে না। কেননা ওয়াকফ সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হল, ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ওয়াকফ পরিচালনা কমিটির দায়িত্বে অর্পণ করে দিবে। এই জন্য একবার ওয়াকফ করে দিলে সে মালের উপর ওয়াকফকারীর কর্তৃত্ব থাকে না, এটি ইমাম মুহাম্মদ রা.-এর উক্তি।

---

২২. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, "ওয়াকফ", *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২১১

২৩. অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি.), পৃ. ৬৬৫

২৪. *আল-মাওসুয়্যাহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ* , খ. ৪৪, পৃ. ২০৫-২১০

ওয়াকফকারী অন্যকে মুতাওয়াল্লী বানালে সে মুতাওয়াল্লী হতে পারে, এমতাবস্থায় নিজেকে মুতাওয়াল্লী বানানো অধিক যৌক্তিক।[২৫] কিছু সংখ্যক আলিমের মত, মসজিদের জন্য ওয়াকফ করলে তাতে মুতাওয়াল্লী বানানো আবশ্যক নয়। কেননা মসজিদ কারও করায়ত্তে দেয়ার প্রয়োজন নেই।

তবে এই মতের উত্তরে বলা হয় যে, মসজিদের জন্যও মুতাওয়াল্লীর প্রয়োজন রয়েছে। যাতে করে সে মসজিদ পরিষ্কার রাখতে পারে এবং দেখাশুনা ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে পারে। তাই ওয়াকফকারী যদি মসজিদের মুতাওয়াল্লীর অধিকার অন্যকে দিয়ে দেয়, তাহলে তা জায়িয হবে।[২৬]

ওয়াকফের মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব

মুতাওয়াল্লী ওয়াকফ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পারিশ্রমিক দিয়ে কর্মী নিযুক্ত করতে পারে। আর পারিশ্রমিক হবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। ওয়াকফ সম্পত্তির প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারে।

মুতাওয়াল্লী ওয়াকফকৃত মসজিদের আয়-ব্যয় হতে পানি ও বিদ্যুৎ বাবদ খরচ করতে পারে। কেউ যদি মসজিদ নির্মাণের জন্য কোন কিছু প্রদান করে, তাহলে মুতাওয়াল্লী এছাড়া ভিন্নকাজে তা খরচ করতে পারবে না। মুতাওয়াল্লী অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতীত ওয়াকফ সম্পত্তির জন্য কোন কিছু ধার করবে না।[২৭]

মুতাওয়াল্লীকে অব্যাহতি দান

ওয়াকফকারী যদি নিজেকে মুতাওয়াল্লী বানায় এবং নিজে মুতাওয়াল্লী হওয়ার শর্ত রাখে আর ওয়াকফ সম্পত্তিতে তার খিয়ানত প্রমাণিত হয়, তাহলে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাকে অব্যাহতি দান করবেন, যাতে করে দরিদ্রদের হক সংরক্ষিত হয়।

নাবালেগ বাচ্চাদের হক সংরক্ষণ করার জন্য তাদের পক্ষে নিয়োগকৃত প্রতিনিধিরা খেয়ানত করলে যেভাবে বিচার বিভাগ হস্তক্ষেপ করতে পারে, অনুরূপ এক্ষেত্রেও বিচারক মুতাওয়াল্লীকে অব্যাহতি দিতে পারবেন।

যদি ওয়াকফকারী এই শর্তারোপ করে যে, রাষ্ট্র প্রধান ও আদালত তাতে মুতাওয়াল্লী পদ হতে অব্যাহতি দিতে পারবে না, তারপরও খিয়ানত পাওয়া গেলে তাকে অব্যাহতি দেয়া হবে। কেননা এই শর্ত শরয়ী বিধানের পরিপন্থী। সুতরাং তা বাতিল বলে গণ্য হবে।[২৮]

---

২৫. ইবনে হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৫, পৃ. ৪০

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

২৮. ইবনে হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৫, পৃ. ৬১

যদি মুতাওয়াল্লী ওয়াকফকারীর জীবদ্দশায় মারা যায়, তাহলে ওয়াকফকারী নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন মুতাওয়াল্লী নির্ধারণ করবে।[২৯] মুতাওয়াল্লী যদি উন্মাদ হয়ে যায় তাহলে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। ওয়াকফ ইসলামী আইনের একটি বিশাল অধ্যায়। এটি এতো স্বল্প পরিসরে ব্যক্ত করা কঠিন। বিস্তারিত জানার জন্য সংশ্লিষ্ট ফিতাবাদি দেখা যেতে পারে।[৩০]

বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমাহাদেশে ওয়াকফ

প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, রাসূলের স. যুগেই আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ইসলামের অমীয় ঝর্ণাধারা বাংলায় প্রবেশ করেছে। তবে এখানে মুসলানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয় ভারত সম্রাট কুতুবউদ্দীন আইবেকের সময়ে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির অভিযানের মাধ্যমে ১২০৩ খৃস্টাব্দে। তিনি বরেন্দ্র অঞ্চলে রংপুর নামক রাজধানী স্থাপন করেন। তবে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল তার শাসনের বাইরে ছিলো। এর শতাব্দীকালেরও বেশ পরে ১৩৩০ খৃস্টাব্দে মুহাম্মদ তুগলুক শাহ পূর্বাঞ্চল জয় করেন এবং সাতগাঁও ও সোনারগাঁও এ যথাক্রমে রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর সোনারগাঁও এর স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮/৪৯ খৃ.) চট্টগ্রাম জয় করেন। এভাবে পুরো বাংলাদেশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়। তবে এর বহু পূর্বেই চট্টগ্রামে ইসলাম প্রবেশ করে।[৩১]

বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর ১৭৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ৫৫৪ বছরে ১০১ জন বা ততোধিক শাসক বাংলা শাসন করেন।[৩২] এ সময়ে ওয়াকফ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে এ অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো তার কিছু চিত্র আমরা পেশ করছি।

বাংলার সুলতানগণ বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অধিকতর অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম জমিদার, লাখেরাজদার, আয়মাদার[৩৩] প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মুসলিম প্রধানগণ তাদের নিজ নিজ এলাকায় মক্তব, মাদরাসা কায়েম করতেন এবং এসবের ব্যয়ভার বহনের জন্যে প্রভূত ধনসম্পদ ও জমিজমা দান করতেন।[৩৪]

---

২৯. আস সারাখসী, *আল মাবসূত*, খ. ১২, পৃ. ৪৪

৩০. মুহাম্মাদ উবাইদ আল কুরাইসী, *আহকামে ওয়াকফ ফী শারীয়াতিল ইসলামিয়া* (বাগদাদ: ১৯৭৭খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২০

৩১. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০২), পৃ. ১৩-২৪

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৩৩. আয়মাদার: ধর্মপ্রচার, শিক্ষকতা বা দাতব্য কার্যের পুরস্কার স্বরূপ মুসলিম রাজা-বাদশাহ থেকে প্রাপ্ত নিষ্কর অথবা নামমাত্র করবিশিষ্ট জমি যে ভোগ করে।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

বাংলার প্রথম সুলতান মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী এবং তিনি দিল্লী সম্রাট কুতুবউদ্দীন আইবেকের অনুকরণে দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩৫]

W. Adam বলেন, রাজশাহী জেলার কসবা বাঘাতে বিয়াল্লিশটি গ্রাম দান করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনসেবামূলক কাজের জন্য। (Adam, second report, P. 37)| কসবা বাঘার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব ছাত্র পড়াশুনা করতো তাদের যাবতীয় খরচপত্রাদি যথা-বাসস্থান, আহার, পোষাক পরিচ্ছদ, বই পুস্তক, খাতা-পেন্সিল, কালি-কলম, প্রসাধন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহন করা হতো।[৩৬]

গোলাম হোসেন তার ইতিহাসে বর্ণনা করেছেন যে, মুর্শিদ খুলি খাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বীরভূমের আসাদুল্লাহ নামক জনৈক জমিদার তার আয়ের অর্ধাংশ জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভরণপোষণ এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন।[৩৭]

ধনবান সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে এ প্রথাও বিদ্যমান ছিলো যে, তারা উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে তাদের সন্তানাদির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। দরিদ্র ছাত্রগণও বিনা পয়সায় তাদের নিকট শিক্ষা লাভ করতে পারতো। পাভুয়াতে এ নিয়ম প্রচলিত ছিলো যে, মুসলিম ভূস্বামীগণ তাদের নিজেদের খরচে প্রতিবেশী দরিদ্র ছাত্রদের বিদ্যাশিক্ষার জন্যে শিক্ষক নিযুক্ত করতেন। এমন কোন বিত্তশালী ভূস্বামী অথবা গ্রামপ্রধান ছিলেন না, যিনি উক্ত উদ্দেশ্যের জন্যে কোন শিক্ষক নিযুক্ত করেননি।[৩৮]

প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমুদয় ব্যয়ভার একজন ব্যক্তি বহন করতেন, সরাসরিভাবে অথবা দান, ওয়াকফ বা ট্রাস্টের মাধ্যমে।[৩৯]

বাংলাদেশের ওয়াকফ অধ্যাদেশ ও আইনসমূহ

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তীতে ওয়াকফ বিষয়ক বিভিন্ন আইন প্রচলিত ছিল। যেমন-

১. Waqf Validating Act. 1913, (১৯১৩ সালের ৬ নং আইন)

২. Bengal Waqf Act-1934 (১৯৩৪ সালের ১৩ নং আইন)

---

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২; A. R. Mallik, *Br. Policy & the Muslims in Bengali*, P. 150

৩৭. Ghulam Hussain, *Seiyere Mutakherin*, Vollll, P. 63, 69, 70 & 165; সূত্রঃ খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৪২

৩৮. Adam, *First Report*, P. 55; Fazlur Rahman, *The Bengali Muslims and English Education*, P. 6

৩৯. আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ. ১৪৩

৩. The Waqfs Ordinance, 1962 (১৯৬২ সালের ১ নং অধ্যাদেশ)
৪. ওয়াকফ (সম্পত্তি ও হস্তান্তর) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫ নং আইন)

এছাড়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে গতি আনার জন্য সরকার ১৯৭৫ ইং সালে **"বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন বিধান"** (The Bangladesh Waqf Administration Rules) নামে একটি বিধান এবং ১৯৮৯ ইং সালে **"বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন কর্মচারী সার্ভিস বিধান"** (The Bangladesh Waqf Administration Employee Service Rules) নামে আরো একটি বিধি চালু করেছে।

তবে বর্তমান আলোচনা শুধুমাত্র ওয়াক্‌ফ প্রশাসন সংক্রান্ত বিধি-বিধিনেই সীমাবদ্ধ। বিধায় মুসলিম ওয়াক্‌ফ আইন ১৯১৩ ইং-এর পর্যালোচনা এখানে করা হবে না, কারণ সে আইনটি ছিল ঘোষণামূলক। ১৯০৮ ইং সালের দেওয়ানী কার্যবিধির ৯২ ধারাটি এ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। কারণ এটি ওয়াক্‌ফ প্রশসানিক কার্যক্রমের জন্য নয়, সেটি শুধু আইনী প্রতিষ্ঠানের জন্য কার্যকর, যা ভুল সংশোধনের অথবা কোন একাউন্ট পরিচালনা বা অথোরাইজড সম্পত্তি হস্তান্তরে ফলপ্রসু হবে। মুসলিম ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ ১৯২৩.ইং ওয়াক্‌ফ প্রশাসন সম্পর্কিত, তবে অতিসাবধানতা এবং কিছু আইনী ফাঁকফোকর ও ত্রুটি থাকায় সেটি অকার্যকর। নিম্নে মুসলিম ওয়াক্‌ফ আইন ১৯২৩ ইং, ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং ও ওয়াক্‌ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩-এর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট ধারা-উপধারাসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উল্লেখ করা হলো:

মুসলিম ওয়াক্‌ফ আইন ১৯২৩ ইং এর পর্যালোচনা

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উত্তম পরিচালনা এবং সম্পত্তির যথাযথ হিসাব পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্যে মুসলিম ওয়াক্‌ফ আইন ১৯২৩ ইং (Mussalman Waqf Act 1923) আইনটি পাশ করা হয়েছিল। এই বিধান অনুযায়ী কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির (ওয়াক্‌ফ লিল আওলাদ ব্যতীত) মুতাওয়াল্লীকে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় ব্যয় সংক্রান্ত একটি বিবরণ কোর্টে দাখিল করতে হবে। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দলিল এর কপি এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অডিট করিয়ে এর একটি হিসাবও দাখিল করতে হবে। তবে যদি কোন ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদান করে, তবে প্রথমবার ৫০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি ভুলের জন্য ২০০০ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

যেহেতু ১৯২৩ইং সালের আইনটি প্রচ-ভাবে সিভিল কোর্ট নির্ভর এবং কোর্ট সর্বদাই বিভিন্ন মামলা মোকদ্দামা নিয়ে অতিব্যস্ত, তাই তাদের পক্ষে এই আইন এর বিধান কার্যকরিভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। তাই কোর্ট দ্বারা তত্ত্বাবধান করা সম্ভব নয় বিধায় ওয়াক্‌ফ প্রশাসন এর উন্নতি হয়নি।

উল্লেখিত আইনটির উপর বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে:

(ক) আইনটির সেকশন ৩ অনুযায়ী মুতাওয়াল্লীকে তার কর্তব্য (হিসাব বিবরণী দাখিল) পালনে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য কোর্টের কোন কর্তৃত্ব নেই। তবে কোন অনিয়ম করলে জরিমানা করার বিধান ছাড়া অতিরিক্ত কিছু এতে নেই।

(খ) দখলদার যদি ওয়াক্ফ সম্পত্তি অস্বীকার করে, তবে এর জন্য কোন বিধান রাখা হয়নি।

এই আইনের অধীনে কোর্ট ওয়াক্ফ সম্পত্তির অবস্থা জানার জন্য কোন তদন্ত করবে কিনা, এর ব্যাখ্যা/উত্তরে ভিন্ন ভিন্ন হাই কোর্ট বিভিন্নভাবে রায় প্রদান করায় এর গুরুত্ব নিয়ে সন্দেহ রয়েই গেল। অতএব, অনেক চেষ্টার পরও মুসলিম ওয়াক্ফ আইন ১৯২৩ ইং অতি সাবধানতা (excessive caution) ও অসম্ভব-এর ভয়ের (illusory fear of discontentment) কারণে তা ব্যর্থ হয়েছে।[৪০]

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং এর পর্যালোচনা

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে পূর্ব পাকিস্তান ওয়াকফ অধ্যাদেশ হিসেবে চালু ছিল। অধ্যাদেশটি ১৯৬২ সালের ১ নং অধ্যাদেশ। এতে ১২টি অধ্যায় ও ১০৫টি ধারা সংযোজিত হয়েছে। ২০১৩ সালে ওয়াকফ (সম্পত্তি ও হস্তান্তর) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ প্রবর্তনের পূর্বে এটি দেশের ওয়াক্ফ প্রশাসন কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রধান আইন হিসেবে বিবেচিত ছিল। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং দ্বারা দেশের ওয়াক্ফ প্রশাসন এবং ওয়াক্ফ স্টেটসমূহের সার্বিক কর্মকা- নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতো।

অত্যন্ত বড় আশা নিয়ে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং প্রচার করা হয়েছিল যে, এটি বাংলাদেশে ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিচালনায় যথাযথ ভূমিকা রাখবে ও কাজে গতি আনবে। কিন্তু কিছু আইনী অপর্যাপ্ততা ও আইনী ফাঁক থাকায় ওয়াক্ফ সম্পত্তির কার্যকর পরিচালনা ও যথাযথ তত্ত্বাবধান এর ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হতে ব্যর্থ হয়েছে।

ড. শাহিন জোহরা 'ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং'-এর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো উল্লেখ করেছেন:

ক. ওয়াক্ফ সম্পত্তির জরিপ সংক্রান্ত বিধান

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং ওয়াক্ফ প্রশাসনকে দেশের সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তি জরিপ করার ক্ষমতা দিয়েছে। ওয়াক্ফ প্রশাসন জরিপ কার্য পরিচালনায় যাদেরকে

---

৪০. Shahin Zohora, "Waqf as Administered in Bangladesh: A Critical Review" in *UITS Journal*, Volume: 2, Issue: 1, June 2013, p. 166

যোগ্য মনে করে তাদেরকে জরিপ কার্যে নিয়োজিত করতে পারবে। এই জরিপের উদ্দেশ্য হল ওয়াক্ফ সম্পত্তির নির্ধারিত/চিহ্নিতকরণ এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তির অবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা নেয়া। তবে এতে কোন বাধ্যবাধকতার বিধান এবং কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয় নাই যে এত তারিখ বা প্রতি ১০/১২ বছর পরপর সময়ের মধ্যে জরিপ কার্য সম্পন্ন করতে হবে। এইজন্য অধ্যাদেশ প্রণয়নের ৫৩ বছর পার হওয়ার পর শুধুমাত্র একবার ওয়াক্ফ সম্পত্তির জরিপ কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছিল স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ১৯৮১ ইং সালে। তবে তাতেও যথাযথ পদ্ধতি ব্যবহরা করা হয়নি। **"ইনাম কমিটি'র"** রিপোর্টে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওয়াক্ফ প্রশাসনের চাহিদা অনুযায়ী জরিপ কাজটি পরিচালনায় ওয়াক্ফ প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ১৯৮৫ ইং সাল পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে দেশে কোন জরিপ কাজ করা হয়নি। ১৯৮৬ ইং সালে ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ওয়াক্ফ প্রশাসক-এর অনুরোধে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিভিন্ন বিভাগে এবং জেলায় ব্যাপকভাবে দেশের ওয়াক্ফ সম্পত্তির উপর একটি জরিপ কাজ পরিচালনা করে। তবে এই জরিপটিতেও বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকার কারণে ওয়াক্ফ প্রশাসনের উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

জরিপ সংক্রান্ত বিধানের মারাত্মক ত্রুটির মধ্যে রয়েছে:

০১. ওয়াক্ফ সম্পত্তির অবৈধ দখলদারিত্ব সম্পর্কে কোন তথ্য এই পরিসংখ্যান রিপোর্টে নেই।

০২. দরগাহ/মাজার ও ওয়াক্ফ আল-আওলাদ সম্পত্তি সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।

০৩. পরিসংখ্যান ব্যুরো বিরোধযুক্ত ওয়াকফ সম্পত্তিতে কোন রকম গুরুত্ব প্রদান করেনি।

তাই দেশের সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তির উপর আরো একটি ব্যাপক জরিপ হওয়া দরকার এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরায় জরিপ করার বিধান আইনে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

খ. মুতাওয়াল্লী অপসারণ করার বিধান

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৩২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ওয়াক্ফ প্রশাসন নিজে অথবা কোন ব্যক্তির আবেদন-এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন মুতাওয়াল্লীকে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে যেমন- ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয়ের ভুল হিসাব প্রদান করা, অতিরিক্ত খরচ দেখিয়ে জাল ভাউচার প্রদান, দান, নজরানা বা বিভিন্ন খাত থেকে আগত টাকার হিসাব না দেখিয়ে তা গোপন করা অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তির অবৈধ হস্তান্তর, রশিদ এ কম পরিমাণ টাকা দেখিয়ে বাকি টাকা আত্মসাৎ করা, জমিদারী, জায়গীরদারী, জরিমানার ঋণপত্র বা ইনামগুলো নিজ নামে করিয়ে এ থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করা প্রভৃতি অভিযোগে অপসারণ করতে পারে।

তবে মুতাওয়াল্লীর অনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করা বা ওয়াক্ফ সম্পত্তির উপর স্থগিতাদেশ জারি করার ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ প্রশাসনের কোন ক্ষমতা নেই। এমনকি অবৈধভাবে হস্তান্তরিত সম্পত্তি অথবা মুতাওয়াল্লী কর্তৃক আত্মসাতকৃত অর্থ উদ্ধারে কোর্টের হস্তক্ষেপ ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। সাথে সাথে এ কথা বলারও অপেক্ষা রাখে না যে, সিভিলকোর্টে কোন সম্পত্তির অভিযোগ নিষ্পত্তি হতে এবং কোন আত্মগোপনকৃত অর্থ মামলার নিষ্পত্তি হতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়, কখনো কখনো এই সম্পত্তি উদ্ধার করাও সম্ভব হয় না। যাই হোক, এটি একটি দুঃখজনক বিষয় যে, এই অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান নেই যে, যদি কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি যদি কোন মুতাওয়াল্লীর সময় নষ্ট হয়ে যায় এবং এ কারণে মুতাওয়াল্লী অপসারিত হয়, তখন এই বিষয়টি মুতাওয়াল্লীর ব্যক্তিগত কৈফিয়ত এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ঠিক তেমনিভাবে যদি কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি মুতাওয়ল্লীর কুকর্মের দরুণ সরকারী খাস জমি হিসাবে রেকর্ড হয়ে যায় তখন এই অপরাধ বন্ধে কি পদক্ষেপ নেয়া হবে তাও বলা হয় নি।

গ. ওয়াক্ফ সম্পত্তির নিবন্ধন সম্পর্কিত বিধান

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং (পূর্ব পাকিস্তান) জারী হওয়ার পূর্বে ওয়াক্ফ সম্পত্তিগুলো বেইল ওয়াক্ফ আইন ১৯৩৪ ইং এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হত। এই আইন-এর অধীনে অনেক সম্পত্তি নিবন্ধিত হয়েছে। তবে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং-এ পুনরায় সকল সম্পত্তির নিবন্ধন এর বিধান রাখা হয়েছে।

পুনরায় নিবন্ধন এর বিধান রাখায় অনেক সমস্যা হয়। যার ফলে বহু ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন এর আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। ফলে ওয়াক্ফ প্রশাসন অনেক ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং বেইল ওয়াক্ফ আইনটিও চিরদিনের জন্য তার কার্যকারিতা হারায়।

ঘ. ওয়াক্ফ সম্পত্তির ধরন নির্ণয় সম্পর্কিত বিধান

কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তি কি না তা ওয়াক্ফ প্রশাসন নির্ধারণ করবে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সিভিল কোর্টের শরণাপন্ন হতে হবে।

যেহেতু সিভিল কোর্ট বিভিন্ন জমিজমার মামলা নিয়ে অতিব্যস্ত, তাই মুতাওয়াল্লী এবং ওয়াক্ফ প্রশাসনকে বিভিন্ন ধরনের বিড়ম্বনা ও খরচের সম্মুখীন হতে হয়।

ঙ. ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত বিধান

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং পরিষ্কারভাবে ওয়াক্ফ প্রশাসনের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন সম্পত্তি মুতাওয়াল্লী কর্তৃক হস্তান্তরে নিষেধ করে। তাই এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী যদি কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ প্রশাসনের অনুমতিতে ছাড়া হস্তান্তরিত হয়ে থাকে, তবে তা

বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ওয়াক্ফ প্রশাসন এই ব্যাপারে অবহিত হওয়ার ৪ মাসের মধ্যে অথবা হস্তান্তর হওয়ার ৩ বছরের মধ্যে তা বাতিলের জন্য আবেদন করবে।

এই বিধানের মারাত্মক ত্রুটি হল তা উদ্ধারের সীমিত সময় নির্ধারণ করে দেওয়া। অথচ এ সময়ের মধ্যে ওয়াক্ফ প্রশাসনের পক্ষে এই জমিটি উদ্ধার করা সম্ভবপর নয়। যার ফলে তা মুতাওয়াল্লী কর্তৃক তা আত্মসাৎ হয়ে থাকে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুতাওয়াল্লী কর্তৃক এই ধরণের কুকর্মের জন্য তাকে এই বিধানে কোন দণ্ডনীয় অপরাধী বলে গণ্য করা হয় না। ফলে এই ধরণের হস্তান্তর রোধ করা সম্ভবপর হয় না।

চ. ওয়াক্ফ সম্পত্তির হিসাবের বিবরণী দাখিল সম্বলিত বিধান

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং অনুযায়ী মুতাওয়াল্লী/কমিটি ওয়াক্ফ সম্পত্তির একটি পূর্ণাঙ্গ সঠিক হিসাবের বিবরণ প্রস্তুত করে ওয়াক্ফ প্রশাসনের নিকট জমা দিতে হবে এবং কোর্ট কর্তৃক ওয়াক্ফ সম্পত্তির জন্য নির্ধারিত কালেক্টর কর্তৃক ও সঠিক হিসাব বিবরণী দাখিল করার বিধান রাখা হয়েছে।

তবে যদি মুতাওয়াল্লী/ কমিটি/কালেক্টর হিসাব বিবরণী দাখিল না করে, তবে তা ৬১ ধারায় কোন দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করার বিধান রাখা হয়নি। যার ফলে মুতাওয়াল্লী/কমিটি/কালেক্টর বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে দেরীতে হিসাব দাখিল করেন বা কখনো কখনো হিসাবই দাখিল করে না, যার ফলে ওয়াক্ফ সম্পত্তি মারাত্মকভাবে অচল হয়ে পড়ে।

ছ. শাস্তি সংক্রান্ত বিধান

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং অনুযায়ী যদি মুতাওয়াল্লী যথাযথ দায়িত্বপালন ও হিসাব প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, তবে ৬১ ধারা অনুযায়ী মাত্র দুই হাজার টাকা বা আরো কোন গুরুতর অপরাধ হলে ৬ মাসের জেল বা উভয়টি একসাথে প্রদান করার বিধান রাখা হয়েছে। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং জারির পাঁচ দশক পার হয়ে গেলেও অদ্যাবধি এই জরিমানা বৃদ্ধি করা হয়নি, যা বর্তমানে এই ধরনের অনিয়ম প্রতিরোধে অতি অপ্রতুল।

জ. ওয়াক্ফ সম্পত্তির চাঁদা/ট্যাক্স সংক্রান্ত বিধান

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং অনুসারে প্রতি মুতাওয়াল্লীকে বার্ষিক আয়ের শতকরা ৫% হারে চাঁদা/ট্যাক্স ওয়াক্ফ প্রশাসনে জমা রাখতে হবে। তবে মোট আয়ের মাত্র ৫% ওয়াক্ফ প্রশাসনের খরচের তুলনায় অপ্রতুল। কারণ, সময়ের চাহিদায় ওয়াক্ফ প্রশাসনের লিল্লাহর প্রধান এর বেতন-ভাতাসহ যাবতীয় খরচ অনেক বৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং মাত্র ৫% টাকা দিয়ে ওয়াক্ফ প্রশাসনের বিভিন্ন খাতের খরচ মিটানো সম্ভব নয়।

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ বাংলাদেশ সংশোধনের বিভিন্ন পদক্ষেপ

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওয়াক্ফ কমিটি ২৬-১০-১৯৯৭ ইং তারিখে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং এর কিছু ধারা উপধারার সংশোধনী আনার লক্ষে এক জরুরী আলোচনা সভায় বসেন। উক্ত আলোচনা সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, সংশোধনী একটি খসড়া প্রস্তাব পরবর্তী মিটিং-এ বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হবে। ওয়াক্ফ কমিটির একটি মিটিং ৩০/০৪/১৯৯৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং সংশোধনীর একটি খসড়াও এতে উপস্থাপন করা হয়। এই মিটিং-এ ওয়াক্ফ প্রশাসন এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ সংশোধনী নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। অন্যদিকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার লক্ষে ২৫শে আগস্ট ১৯৯৮ইং তারিখে একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিটির মাননীয় সদস্যবর্গ এই মর্মে চূড়ান্তভাবে একমত পোষণ করেন যে, ওয়াক্ফ অধ্যাদেশে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে। পাশাপাশি ইসলামী এবং শরীয়াহ্ আইনকে ওয়াক্ফ প্রশাসনে আরো শক্তিশালী ও যুগপোযোগী করার লক্ষে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। ওয়াক্ফ প্রশাসনের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা পর্যালোচনা করার পর ধর্ম মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ৩ জন মাননীয় সংসদ সদস্যকে সদস্য করে ওয়াক্ফ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার লক্ষে একটি সাব-কমিটিও গঠন করে।[৪১]

১১ নভেম্বর ১৯৯৮ইং তারিখে ওয়াক্ফ প্রশাসন অফিসে ওয়াক্ফ কমিটির একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং এ সংশোধনী প্রস্তাবনাকে বিবেচনার জন্য আলোচনা করা হয় এবং এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের বিভিন্ন ধারা-উপধারা সংশোধনীর লক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ সংশোধনী প্রস্তাবনা জাতীয় সংসদে পেশ করা হবে। পরবর্তীতে ওয়াক্ফ প্রশাসন ও ওয়াক্ফ সম্পত্তির বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনী সমস্যার সমাধানকল্পে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের বিভিন্ন ধারা উপধারা সংশোধনীর জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদয় অবগতি ও বিবেচনার জন্য ৩ মার্চ ১৯৯৯ ইং তারিখে উপস্থাপন করা হয়।[৪২]

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং সংশোধনী প্রস্তাবনার পর্যালোচনা

এই প্রস্তাবনার মাধ্যমে ধর্ম মন্ত্রণালয়াধীন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাব কমিটি এবং ওয়াক্ফ কমিটি ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং এর কিছু ধারা উপধারা সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন-এর দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

---

৪১. Ibid, p. 170

৪২. Ibid

ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ সংশোধনী প্রস্তাবনার উপর একটি বিশ্লেষণ

উল্লেখিত সংশোধনী প্রস্তাবনার কিছু ধারা ও দিক নির্দেশনার উপর কিছু আলোচনা নিম্নে পেশ করা হল:

ওয়াক্‌ফ কমিটি এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়াধীন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাব কমিটির দিক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রথমে সংশোধনী প্রস্তাবনায় ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং এর ধারা ২ এর কিছু সংজ্ঞা সংযুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাটি হল Waqf by user এর সংজ্ঞা। অর্থ্যাৎ যদি কোন ভূ-সম্পত্তি আদিকাল থেকে ধর্মীয় প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন- মসজিদ, কবরস্থান অথবা কোন মাজারের দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান (চেরাগী/ পিরোতান/ পিরপোল/ যিম্মাদার/ খাদেমদারী/ জমি, যা সাধারণ মানুষ দ্বারা ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত হয়েছে) সে সম্পত্তিগুলো ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হবে, যদিও এই সম্পত্তি উৎসর্গ বা ওয়াক্‌ফ করার কোন প্রমাণ নেই। যেহেতু ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান ছিল না যে, মসজিদ, ঈদগাহ, ইমামবারা, দরগাহ, মাজার, খানকাহ, তাকিয়া (চেরাগী/ পিরোতান/ পিরপোল/ যিম্মাদার/ খাদেমদারীর সম্পত্তি, যা সাধারণ মানুষ যারা ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত হয়েছে) সংযুক্ত ভূ-সম্পত্তি Waqf by user হিসাবে গণ্য হবে, সেহেতু এই উপধারাটি সংযুক্ত করা হয়েছে। কারণ Waqf by user হিসাবে গণ্য করা হবে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ ছিলনা।

ওয়াক্‌ফ প্রশাসনে রক্ষণাবেক্ষণে গতি আনার লক্ষে ওয়াক্‌ফ কমিটির অনুমোদনক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুতওয়াল্লীর স্থলে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা। এই প্রস্তাবনায় ধারা নং-২৭ একটি উপধারা সংযুক্ত করা হয়েছে। কারণ ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশে ৩৪ নং ধারা অনুযায়ী প্রশাসন একটি অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে এবং প্রয়োজনে (শুধুমাত্র মাজার, দরগাহ, ইমামবাড়া) পরিচালনার জন্যে একটি কমিটি গঠন করতে পারে। তবে উল্লেখিত তিনটি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যতীত অন্য কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে যদি প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, তবে কোন কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, এই মাজার, দরগাহ অথবা ইমামবাড়া ব্যতীত অন্যান্য ওয়াক্‌ফ সম্পতিতে কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ২৭ ধারায় একটি নতুন উপধারা সংযোজন করার জন্য সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে।[৪৩]

এই প্রস্তাবনায় ২৭নং ধারায় ওয়াক্‌ফ প্রশাসন কর্তৃক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞায় আরো একটি উপধারা সংযুক্ত করা হয়েছে। এই উপধারা অনুযায়ী ওয়াক্‌ফ প্রশাসন

---

৪৩. Ibid, p. 172

মুতাওয়াল্লী/কমিটি প্রত্যাহার করত একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করে একজন অফিসিয়াল কালেক্টর নিয়োগ প্রদান করতে পারে। এছাড়াও ওয়াক্ফ প্রশাসন সম্পত্তিতে দুর্নীতি এবং অপব্যবহার রোধে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৩২নং ধারা অনুযায়ী মুতাওয়াল্লী যদি কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি অপব্যবহার করে অথবা ৬১ ধারা অনুযায়ী কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয় অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তি পচিালনায় অনুপোযুক্ত অসমর্থ ও অবহেলাকারী হয় তবে ওয়াক্ফ প্রশাসন কর্তৃক অপসারিত হবে। তবে এ ধারায় এমন কোন বিধান রাখা হয়নি যে, মুতাওয়াল্লী কর্তৃক এ ধরনের ওয়াক্ফ সম্পত্তির অপব্যবহার বা অবহেলার জন্য যে ক্ষতি হবে তা ব্যক্তিগত দায় হিসাবে পরিগণিত হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য থাকবে এবং Public Demand Recovery Act 1913 অনুযায়ী এ সম্পত্তিটি উদ্ধার্য।[৪৪]

এই উপধারাটি সংযুক্তির ফলে আশা করা যায় যে, মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফ সম্পত্তি বেপরোয়া অপব্যবহার অথবা অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে অতীব সাবধান হবে।

ওয়াক্ফ সম্পত্তি নিবন্ধন বিষয়ে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং অনুযায়ী পূর্বের সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তি ওয়াক্ফ প্রশাসনে নিবন্ধন করতে হবে। এ ধারা অনুযায়ী পূর্বের সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তি, যা বেঙ্গল ওয়াক্ফ আইন ১৯৩৪ইং এর মাধ্যমে নিবন্ধিত, তা পুনরায় নতুন করে নিবন্ধন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ কারণেই সংশোধনী প্রস্তাবনায় (৪৭) নং ধারায় একটি উপধারা (১) এই মর্মে সংযোজন করা হয়েছে যে, যে সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তি বেঙ্গল ওয়াক্ফ আইন ১৯৩৪ইং অধীনে নিবন্ধিত সে সকল সম্পত্তি পুনরায় নতুন করে নিবন্ধন করার প্রয়োজন নেই এবং ঐ সম্পত্তিগুলো ১৯৬২ইং সনের আইনের আওতায় পরিগণিত হবে। ফলে নতুন করে নিবন্ধন করার জটিলতা থেকে উত্তরণের পথ পাওয়া গেল।

এই প্রস্তাবনার ৫২ ধারার ডি (d) উপধারায় আরো ১টি নতুন উপধারা সংযুক্ত করা হয়েছে এই মর্মে যে, মুতাওয়াল্লী/কমিটি প্রশাসন/অডিটর চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় হিসাবের কাগজ পত্র উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে তবে তা ৬১ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। এ ধারা অনুযায়ী মুতাওয়াল্লী/কমিটি প্রশাসন বা অডিটর এর চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজ এবং হিসাব উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবে এবং তাদের এটিও জানা থাকবে যে যদি হিসাব ও কাগজপত্র প্রদানে ব্যর্থ হয় তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।[৪৫]

---

৪৪. Ibid

৪৫. Ibid, p. 173

মুতাওয়াল্লী/কমিটি কর্তৃক ওয়াক্ফ সম্পত্তির অবৈধ হস্তান্তর রোধে এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি উদ্ধার করার লক্ষে ওয়াক্ফ কমিটি এবং সংসদীয় স্থানীয় কমিটি সংশোধনী প্রস্তাবনার মাধ্যমে ৫৬ ধারার (৩) উপধারা আইনী সীমাবদ্ধতা উঠিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করে।

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ইং এর ৬০ নম্বর ধারায় ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে মুতাওয়াল্লী/কমিটি কর্তৃক অতিরিক্ত খরচ কমানোর লক্ষে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে যে, মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় থেকে ৪৭ ধারা অনুযায়ী কোন কাগজ পত্র তৈরি বা কপি অথবা ৫২ ধারা অনুযায়ী কোর্টে আপিল করার জন্য কোন খরচ করতে পারবেনা।

তবে শুধুমাত্র কোর্টের নির্ধারিত ফি ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকে নিতে পারবে, এ ধারার অধীনে যদি মুতাওয়াল্লীর কোন মিথ্যা বা অসত্য বা অপর্যাপ্ত বিবরণ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অপর্যাপ্ত এবং এই বিধান অনুযায়ী মুতাওয়াল্লীর দুর্নীতি থামানো কখনো সম্ভব হবেনা।

একারণেই মুতাওয়াল্লীর দুর্নীতির কারণে অপসারিত হলে (২০০০) টাকার পরিবর্তে (১০,০০০) টাকা জরিমানার বিধান এবং ৬ মাসের কারাদণ্ডের পরিবর্তে মাত্র ২ বছর কারাদণ্ডের বিধান সংশোধনী প্রস্তাবনায় সুপারিশ করা হয়েছে। ওয়াক্ফ প্রশাসনের খরচ নির্বাহের জন্য ওয়াক্ফ সম্পত্তি বার্ষিক আয়ের ৫% হারে ওয়াক্ফ প্রশাসনের আয় নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এদিয়ে ওয়াক্ফ প্রশাসনের বিভিন্ন খরচ নির্বাহ করা সম্ভব নয় বিধায় সংশোধনী প্রস্তাবনায় ৫% এর স্থলে ১০% এর সুপারিশ করা হয়েছে।

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৭২ নম্বর ধারা ২ উপধারাটি সংশোধনী প্রস্তাবনায় পূণঃস্থাপন করা হয়েছে। এই নতুন উপধারা অনুযায়ী ওয়াক্ফ প্রশাসন ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। ৭৪ ধারার ১নং উপধারা অনুযায়ী ওয়াক্ফ সম্পত্তি সম্পর্কে কোন মামলা পরিচালনার জন্য প্রশাসন কোন আইনজীবী নিয়োগ করলে ফান্ড না থাকার কারণে তার জন্য কোন খরচ গ্রহণ করতে পারতো না।

সংশোধনী হচ্ছেঃ এই ধারাটি বাতিল করার লক্ষে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের সংশোধনী প্রস্তাবনার ওয়াক্ফ প্রশাসন একটি ফান্ডের অনুমোদন দেয়। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং এর সংশোধনী প্রস্তাবনায় ৮১নং ধারার ৫নং উপধারা নামে একটি নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে।

ধারাটি হলোঃ "যদি কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি মুতাওয়াল্লী/কমিটি এর অবহেলার কারণে পৌরসভার কর, জমি উন্নয়ন কর, আয়কর, বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, গ্যাস বিল ইত্যাদি পরিশোধ না করার কারণে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রির অথবা নিলামের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়, তবে একটি অগ্রিম নোটিশ দিতে হবে, যা ওয়াক্ফ প্রশাসনের পক্ষ থেকে

দেয়া হবে।" এই ধারাটি সংযোজনের ফলে মূল্যবান ওয়াক্ফ সম্পত্তি প্রতারণা ও জালিয়াতি হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করাও সম্ভব হবে।[৪৬]

ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে যে কোন ধরণের অপরাধ প্রবণতা রোধ করার লক্ষে সংশোধনী প্রস্তাবনায় ৮৪ ধারার ২ উপধারায় একটি ধারা সংযোজন করা হয়েছে যে, ওয়াক্ফ সম্পত্তির কোন সুবিধাভোগী ব্যক্তি বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে ওয়াক্ফ সম্পত্তি কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হলে অধ্যাদেশের ৬১ ধারা অনুযায়ী তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। ওয়াক্ফ বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার হয় যে, ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের কিছু ধারা উপধারা সংশোধন করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। প্রায় পাঁচ যুগ পূর্বে অধ্যাদেশটি জারি করা হয়েছিল, যাই হোক এত বছর পরে কালের প্রবাহে সমাজে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। তাই ওয়াক্ফ প্রশাসনে একটি গতিশীল কার্যকরী আইন প্রণয়ন করা জরুরী। তাই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের সংশোধনী প্রস্তাবনাটি শুধুমাত্র মুসলিম সমাজের প্রয়োজনেই নয় বরং তা যুগের চাহিদাও বটে।

ওয়াক্ফ আইন, ২০১৩ এর পর্যালোচনা

২০১৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্তান্তর ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশেষ বিধান করার লক্ষ্যে "ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩" (২০১৩ সনের ৫ নং আইন) শিরোনামে একটি আইন প্রণয়ন ও পাস করা হয়।[৪৭] আইনটির শুরুতেই এটি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলা হয়েছে, "যেহেতু ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্ত ান্তর ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশেষ বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল;"। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আইনটি শুধুমাত্র ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্তান্তর ও উন্নয়ন বিষয়ক। এটি ওয়াকফ বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ আইন নয়। একইভাবে এটিও প্রমাণিত হয় যে, ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্তান্তর ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া ইতঃপূর্বে অনিয়ন্ত্রিত ছিল এবং পূর্বের কোন আইনে এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বিধান ছিল না। নিম্নে আইনটির গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহের পর্যালোচনা বিধৃত হলো।

এক: হস্তান্তর পদ্ধতি

আইনটির ৪ নং ধারায় সম্পত্তি হস্তান্তরের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই আইনের অধীন নিম্নরূপ পদ্ধতিতে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাবে, যথা:

---

৪৬. Ibid

৪৭. আইনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকায়ের আইন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে নিম্নের লিংকে বর্তমান রয়েছে। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1109, 28.01.2015

ক. বিক্রয়ের মাধ্যমে;

খ. দানের মাধ্যমে;

গ. বন্ধকের মাধ্যমে;

ঘ. বিনিময়ের মাধ্যমে;

ঙ. ইজারা প্রদানের মাধ্যমে; এবং

চ. অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তরের মাধ্যমে।[৪৮]

ইসলামী ফিকহের গ্রন্থসমূহে ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তান্তরের এসব পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে উক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ বিধৃত হলো:

ক. ওয়াকফকৃত সম্পদ বিক্রয় বা বিনিময়: ফকীহগণ ওয়াকফের সম্পদ বিক্রয় ও বিনিময়ের বিধান একই সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এ বিধান সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এমনকি একই মাযহাবের বিভিন্ন ইমাম বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। একদল আলিমের মতে, কোন অবস্থাতেই ওয়াকফের সম্পত্তি বিক্রয় বৈধ নয়। অন্য একদলের মতে বৈধ। হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে ওয়াকফ সম্পত্তি মসজিদ হলে তা কোনক্রমেই বিক্রয় বা বিনিময় বৈধ নয়। অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করার বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও সাহেবাইনের[৪৯] মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে, অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করা বৈধ নয়; কিন্তু সাহেবাইনের মতে বৈধ এবং এর উপযোগিতা নষ্ট হয়ে গেলে তা বিক্রয় বা বিনিময়ও বৈধ। এ মাযহাবের দৃষ্টিতে ওয়াকফকৃত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা বিনিময়ের বিধান এর স্বরূপের উপর নির্ভর করে। যদি ওয়াকফকারী নিজের বা অন্যের জন্য উক্ত সম্পদ বিক্রি বা বিনিময়ের শর্তারোপ করে থাকেন তবে সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে তা বিক্রয় ও বিনিময় বৈধ। কিন্তু যদি ওয়াকফকারী এ রূপ শর্তারোপ না করে থাকেন এবং উক্ত সম্পত্তি অকার্যকর তথা তা থেকে উপকার গ্রহণের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ফকীহের মতে তা বিক্রি ও বিনিময় বৈধ। তবে এ প্রসংগে ইমাম সারাখসী, নাসাফী, ইবন নুজাইম প্রমুখ প্রসিদ্ধ ফকীহের মতে, এটি বৈধ নয়।[৫০] এ প্রসংগে মালিকী মাযহাব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ভিন্ন ভিন্ন বিধান

---

৪৮. ধারা ৪, "ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩" (২০১৩ সনের ৫ নং আইন)

৪৯. হানাফী মাযহাবে সাহেবাইন দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসূফ রহ.।

৫০. এ বিষয়ে হানাফী মাযহবের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলা আদ-দুররুল মুখতার* (বৈরূত: দারুল ফিকর,), খ. ৪, পৃ. ৩৭৯; কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, শারহ ফাতহিল কাদীর (বৈরূত: দারুল ফিকর,), খ. ৪৬, পৃ. ২২০; আল-কাসানী, *বাদাইউস সানায়ী'* (কায়রো: মাতবায়াতুল ইমাম,), খ. ৮, পৃ. ৩৯১২; আস-সারখসী, *আল-মাবসূত* (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৯৮৬খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ৪১

নির্ধারণ করেছে। ইমাম মালিক রহ.সহ জমহুর ফকীহের মতে, ওয়াকফ স্থাবর সম্পত্তি হলে তা বিক্রয় বা বিনিময় বৈধ নয়। এমনকি এর উপযোগিতা নষ্ট হলেও। তবে অস্থাবর সম্পত্তির উপযোগিতা নষ্ট হলে বা তা থেকে উপকার প্রাপ্তি অসম্ভব হলে সকলের মতে বিক্রয় বা বিনিময় বৈধ।[৫১] ওয়াফককৃত সম্পত্তি বিক্রয় ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক কঠোরতা প্রদান করেছে শাফিয়ী মাযহাব। তাদের দৃষ্টিতে কোন অবস্থায় ওয়াকফকৃত মসজিদ বিক্রি বা বিনিময় বৈধ নয়। শুধুমাত্র এটি পতিত ও অনাবাদী হওয়ার উপক্রম হলে কেউ কেউ তা বিক্রি করার পক্ষে মত দিয়েছেন। অস্ত াবর সম্পত্তির বিধানের ব্যাপারেও এ মাযহাবে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়াকফের সম্পত্তি বিক্রয় বা বিনিময় বৈধ না হওয়ার পক্ষে মত দেয়া হয়েছে।[৫২] হাম্বলী মাযহাবের জমহুর ফকীহগণের মতে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি স্থাবর বা অস্থাবর যাই হোক প্রয়োজন ও কল্যাণ বিবেচনায় তা বিক্রয় বা বিনিময় বৈধ। এ বিষয়ে ইমাম আহমদ রহ. থেকে একাধিক মত বর্ণিত হয়েছে।[৫৩]

অতএব বলা যায়, ওয়াকফ বিশেষ আইন ২০১৩ এ জারীকৃত সম্পত্তি হস্তান্তরের পদ্ধতি হিসেবে বিক্রয় ও বিনিময়ের যে বিধান রাখা হয়েছে তার সমর্থনে বিভিন্ন যুগের ফকীহগণের মত রয়েছে।

খ. ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ইজারা প্রদানঃ ওয়াকফকৃত সম্পদ ইজারা প্রদান বৈধ। ফকীহগণ তাদের গ্রন্থসমূহের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ইজারার বিধান, ইজারা প্রদান কার কর্তৃত্বাধীন, ইজারার ক্ষেত্রে ওয়াকফকারীর শর্তের গুরুত্ব, ভাড়া গ্রহণের যোগ্যপাত্র কে? ভাড়ার পরিমাণ, ভাড়ার মেয়াদকাল, ইজারা চুক্তির সমাপ্তি

---

৫১. আল-হাত্তাব, *মাওয়াহিবুল জলীল শারহ মুখতাসার খালীল* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ্রি.), খ.৭, পৃ. ৬৬১; আল-খারশী, হাশিয়্যাতুল খারশী আলা মুখতাসারি সাইয়্যিদি খলীল (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৭খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩৯২; আদ-দাসূকী, *হাশিয়্যাতুদ দাসূকী আলাশ শারহিল কাবীর* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪৭৮; আল-কারাফী, *আল-জাখীরাহ* (বৈরূতঃ দারুল গারব আল-ইসলামী, ১৯৯১খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৩৩১

৫২ আন-নাভভী, *রাওদাতুত তালিবীন*, বিশ্লেষণঃ আদিল আব্দুল মাওজূদ ও আলী মু'আওয়াদ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪১৯; আর-রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ* (কায়রোঃ মাতবাআতু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৬৭খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৯৫; আল-মাওয়ারদী, *আল-হাভী আল-কাবীর*, বিশ্লেষণঃ আদিল আব্দুল মাওজূদ ও আলী মু'আওয়াদ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৫১১

৫৩. ইবন কুদামা, *আল-মুগনী* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২২৫; আল-ফুতুহী, *মুনতাহা আল-ইরাদাত*, বিশ্লেষণঃ আব্দুল গনী আব্দুল খালেক (কায়রোঃ আলিমুল কুতুব, খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৯; আল-মারদাভী, *আল-ইনসাফ*, বিশ্লেষণঃ মুহাম্মদ হামেদ আল-ফাক্কী (বৈরূতঃ দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৫৭খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩০১

ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।[৫৪] যা থেকে প্রমাণিত হয়, আইনের এ ধারাটির সাথে ইসলামী ফিকহের কোন বিরোধ নেই।

গ. দানের মাধ্যমে হস্তান্তর: কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে দান করতে হলে কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে এবং দান সম্পাদিত হলে কিভাবে দানকৃত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যবহার করতে হবে, তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে আইনের ধারা-১১-এ। এই ধারায় ৪টি উপধারা রয়েছে। উপধারাগুলো হলো:

১১। (১) ধারা ৫ এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অন্য কোন ওয়াক্‌ফ এস্টেট বা, মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত নয়, এমন কোন ধর্মীয়, শিক্ষা বা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে দান করা যাইবে।

(২) এই ধারার অধীন দান এর প্রস্তাব কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৩) কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এই ধারার অধীন কোন সম্পত্তি দান এর মাধ্যমে প্রদত্ত ও গৃহীত হইয়া থাকিলে উক্ত উদ্দেশ্য বহির্ভূত অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন সম্পত্তি নির্ধারিত উদ্দেশ্য বহির্ভূত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে, বা ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইলে, ওয়াক্‌ফ প্রশাসক অধ্যাদেশ এর ধারা ৩৪ এর অধীন উক্ত সম্পত্তি নিজ নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ঘ. অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর

এই আইন অনুযায়ী কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে বিশেষ কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। এ প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি কী হবে এবং কিভাবে তা সম্পাদিত হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা এ ধারার উপধারাসমূহে বর্ণিত হয়েছে। ধারাটি হলো,

১২। (১) কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করা যাইবে।

(২) এই আইনের অধীন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির হস্তান্তর বিশেষ কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনের ভিত্তিতে করিতে হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ধারা ১০ এর বিধান অনুযায়ী ভূমি-মালিক ও

---

৫৪. এ বিষয়ক আলোচনার জন্য দ্র. *আল-মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়িতিয়্যাহ*, খ. ৪৪, পৃ. ১৭৪-১৮৫

ডেভেলপার এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে; এবং এতদুদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত মোতাওয়াল্লী বা, ক্ষেত্রমত, ওয়াক্ফ প্রশাসক ভূমি-মালিক হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৪) একজন ভূমি-মালিক নিজ ভূমির ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থ রক্ষা করিয়া যেরূপ শর্তে ডেভেলপারের সহিত চুক্তি করেন, এই ধারার অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করিবার ক্ষেত্রে মোতাওয়াল্লী বা, ক্ষেত্রমত, ওয়াক্ফ প্রশাসক সেরূপ শর্তে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা উহার স্বত্বভোগীদের (beneficiary) স্বার্থ রক্ষা করিয়া ডেভেলপারের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষেত্রে উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে ওয়াক্ফ প্রশাসকের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ থাকিবে এবং চুক্তিতে তাহা উল্লিখিত থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সম্পত্তির উন্নয়ন হইতেছে কিনা এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা উহার স্বত্বভোগীদের (beneficiary) প্রয়োজন, কল্যাণ ও স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হইতেছে কিনা ওয়াক্ফ প্রশাসক তাহা নিশ্চিত হইবেন।

(৬) এই ধারার অধীন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের মাধ্যমে ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে রিয়েল এষ্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর অন্যান্য বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

(৭) এই ধারার অধীন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর কেবল তফসিলে বর্ণিত কোন এলাকায় অবস্থিত ওয়াক্ফ সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

দুই: সম্পত্তি হস্তান্তরে সাধারণ সীমাবদ্ধতা

এই আইনের অধীনে সম্পত্তি হস্তান্তরে কিছু সাধারণ সীমাবদ্ধতা রয়েছে । সেগুলো আইনটির ৫ নং ধারায় ৪ টি উপধারায় বর্ণিত হয়েছে। উপধারাগুলো হলো,

(১) ওয়াক্ফ সম্পত্তি কেবল সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফ কিংবা উক্ত ওয়াক্ফের স্বত্বভোগীদের (beneficiary) প্রয়োজনে, কল্যাণে ও স্বার্থে হস্তান্তর করা যাবে; এবং অনুরূপ হস্ত ান্তর ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

(২) অধ্যাদেশ এর ধারা ২(৯) মতে ওয়াক্ফে আগন্তক (stranger) এমন কোনো ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং তার স্বার্থে বা প্রয়োজনে ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাবে না।

(৩) ওয়াক্ফ কিংবা এর স্বত্বভোগীদের (beneficiary) প্রয়োজন, কল্যাণ ও স্বার্থে অনিবার্যভাবে আবশ্যক বিবেচিত না হলে, কোনো ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রয় বা চিরস্থায়ী ইজারামূলে হস্তান্তর করা যাবে না।

(৪) এই আইনের অধীন হস্তান্তরের জন্য বিবেচ্য কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি, যদি ওয়াকিফ তার ওয়ারিশগণ, পরিবারের সদস্যগণ বা নির্ধারিত ব্যক্তিগণের উপকারার্থে করে থাকেন, তা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাবে না।

হস্তান্তরলব্ধ অর্থ ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা

হস্তান্তরলব্ধ অর্থ ব্যবহারেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আইনটির ৬ নং ধারায় বর্ণিত সীমাবদ্ধতা হলো, "ওয়াক্ফ সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফ এর যেরূপ প্রয়োজনে, কল্যাণে ও স্বার্থে হস্তান্তর করা হবে, হস্তান্তরলব্ধ অর্থ কেবল অনুরূপ প্রয়োজনে, কল্যাণে ও স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে।

তিনঃ মোতাওয়াল্লী বা ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক হস্তান্তর

ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ এর ৭ নং ধারায় কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি মোতাওয়াল্লী বা ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক হস্তান্তর করা যাবে কিনা? গেলে শর্ত কী? কখন এ ধরনের হস্তান্তর অবৈধ ও অকার্যকর হবে? ইত্যাদি বিষয়াবলি বর্ণিত হয়েছে। আইনটির সংশ্লিষ্ট উপধারাগুলো হলোঃ

৭। (১) অধ্যাদেশের ধারা ৩৪ এর অধীন ওয়াক্ফ প্রশাসক নিজ নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যতিরেকে অন্য সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তি কেবল সংশ্লিষ্ট মোতাওয়াল্লীর লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে, ওয়াক্ফের প্রয়োজন, কল্যাণ ও স্বার্থে এবং ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, ধারা ৪ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা যাইবে।

(২) অধ্যাদেশের ধারা ৩৪ এর অধীন ওয়াক্ফ প্রশাসক নিজ নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ ওয়াক্ফ সম্পত্তি, ওয়াক্ফ প্রশাসকের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে, ওয়াক্ফের প্রয়োজন, কল্যাণ ও স্বার্থে এবং ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, ধারা ৪ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোতাওয়ালস্নী বা ওয়াক্ফ প্রশাসক, বিশেষ কমিটির সুপারিশ এবং সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রয়, দান বিনিময়, বন্ধক বা ০৫(পাঁচ) বছরের অধিক মেয়াদের জন্য ইজারা এবং অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, উক্তরূপ সুপারিশ ও অনুমোদন ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা হইলে অনুরূপ হস্তান্তর অবৈধ ও অকার্যকর হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বিশেষ কমিটির সুপারিশ যুক্তিসংগত ও প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলেই কেবল সরকার অনুমোদন প্রদান করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন ৫(পাঁচ) বছরের কম মেয়াদের জন্য ইজারামূলে হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে কোনরূপ স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

উপসংহার

ওয়াকফ-এর ক্ষেত্রে আমাদের জাতির রয়েছে স্বর্ণালী ইতিহাস। বর্তমান পৃথিবীতেও ওয়াকফ খাতে প্রদত্ত দান দ্বারা বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠছে। আরব মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন বাংলাদেশসহ দরিদ্র মুসলিম দেশসমূহে মানব সম্পন্ন উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশেও রয়েছে যথেষ্ট ওয়াকফ সম্পদ। এই সম্পদের পরিমাণ রেকর্ড ও ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের জাতির অগ্রগতিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সবাই সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা পালন করলে ওয়াকফের মূল উদ্দেশ্য হাসিল হবে। এ জন্য নিম্নে কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরা যায়:

১. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ওয়াকফ প্রদান ও এ সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের যে অভূতপূর্ব নজির আমাদের ইতিহাসে রয়েছে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

২. ওয়াকফ সম্পদের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত জরিপ কার্যক্রম, গবেষণা ও কার্যকর পদক্ষেপ পরিচালনা করা।

৩. নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত উভয় প্রকার ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ রেকর্ডের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪. সরকারী ওয়াকফ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পরপর তাদের সার্বিক কার্যক্রমের রিপোর্ট এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর হতে ওয়াকফ সম্পদ ব্যবস্থাপনার অগ্রগতির সারাংশ জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

৫. সরকারী ওয়াকফ প্রশাসনের অফিসের সংখ্যা ও জনশক্তি আরো বাড়ানো প্রয়োজন।

৬. ওয়াকফ আইন ও বিধিমালাকে আরো সুন্দর ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা।

৭. ওয়াকফ কার্যক্রমের সাথে সুদের সম্পর্ক বন্ধ করতে হবে। কারণ ওয়াকিফ নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করেন। এই সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুদকে এড়িয়ে চলাটা তাই আরো অধিক গুরুত্বের দাবীদার।

ওয়াকফ আইন, ১৯৬২-র কোন কোন ধারা ও বিধিমালায় সুদের উপস্থিতিকে মেনে নেয়া হয়েছে। যেমন : 'ধারা-৭২' বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন বিধি, ১৯৭৫-এর 'বিধি-৮' এর ৯-ক ও খ, ১২-ক, ১৩, ১৮-গ, ১৯-গ ও ঘ ইত্যাদি।

৮. বস্তুবাদ ও বস্তুবাদ প্রভাবিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপকার গ্রহণকারীদের মনে সাধারণত দীনতাবোধ সৃষ্টি হয়। তাই এরূপ যৌক্তিক উপস্থাপনা থাকা জরুরী, যাতে করে ওয়াকফ হতে উপকৃত ব্যক্তিদের মনে হীনমন্যতা সৃষ্টি না হয়। এছাড়াও ওয়াকফ সম্পদ দ্বারা মানুষের শুধু তাৎক্ষণিক উপকার সাধন করাই হবে না; বরং এই সম্পদকে সুদক্ষ মানবসম্পদ তৈরির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা হবে। এতে করে উপকৃত ব্যক্তিরা নিজেদেরকে নিছক দানপ্রাপ্ত অসহায় আদম সন্তান মনে না করে মানব সভ্যতার উন্নয়ন কর্মী বলে ভাবতে পারবেন। আর আমাদের অতীতে এর যথেষ্ট নজির আছে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭
জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬

যুগ সমস্যার সমাধানে সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মুফতি মুহাম্মাদ সাআদ হাসান*

Necessity and importance of Collective Ijtihad in solving problems of the current Age

ABSTRACT

In striving for perfection in knowledge and science and facing the challenges of a changing world, man continues to face different issues and challenges. Among the new issues surfacing are those which are not subject to any rulings from the Quran-Sunnah. In light of the fluidity and utility of Islam, there is a strong need for dealing of such issues in light of the rulings of the Shariah. The methodology of collective ijtihad is a strong way to deal with such issues. The article introduces the concept of ijtihad and discusses its necessity, introduction to the available institutions capable of performing collective ijtihad and a discussion of their roles. To bring into context, the discussion includes introduction to the concept of fatwa, and the relationship of fatwa with collective ijtihad. The article clearly proves that collective ijtihad is important in dealing with new issues and in providing solutions to old issues in light of changing trends in the modern world.

Keywords: Fatwa; ijtihad; Collective ijtihad; Fiqh academy

সারসংক্ষেপ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও জীবনের গতি ধারার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে মানুষ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছে। জীবনযাত্রায় যুক্ত হচ্ছে এমন সব বিষয়, কুরআন-সুন্নাহে সরাসরি যে সম্পর্কে কোন বিধান বর্ণিত হয়নি। ইসলামের গতিশীলতা ও উপযোগিতার প্রশ্নে এসব বিষয়ের শরয়ী নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সম্মিলিত ইজতিহাদ এসব অধুনিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের অন্যতম মাধ্যম। আলোচ্য প্রবন্ধে সম্মিলিত ইজতিহাদের পরিচিতি, এর প্রয়োজনীয়তা, বর্তমান সময়ে সম্মিলিত ইজতিহাদের দায়িত্ব পালনকারী

---

* শিক্ষক, জামিআ মাহমুদিয়া, দেশীপাড়া, গাজীপুর।

বিভিন্ন সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক হিসেবে ফাতওয়ার পরিচয়, ফাতওয়ার সাথে সম্মিলিত ইজতিহাদের সম্পর্কও তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, বর্তমান সময়ে নতুন নতুন বিষয়ের বিধান নির্ধারণ ও পুরাতন অনেক বিষয়ের স্বরূপ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে তার বিধানে নতুন নতুন ধারা সংযোজনের ক্ষেত্রে সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

মূলশব্দ: ফাতওয়া; ইজতিহাদ; সম্মিলিত ইজতিহাদ; ফিকহ একাডেমি।

ভূমিকা

ইসলামের দৃষ্টিতে ফাত্ওয়া প্রদান অত্যন্ত গুরুতর ও স্পর্শকাতর একটি বিষয়। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবয়ে তাবেয়ীন, উম্মতের আয়িম্মায় মুজতাহিদীন ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলিমগণ ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের কাছে কেউ ফাত্ওয়া জানতে আসলে তারা প্রশ্নকারীকে যথাসম্ভব অন্যের দারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিতেন। কেননা ফাতওয়া প্রদানের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল-এর পক্ষ হতে প্রতিনিধিত্ব করা। এ কারণে ফিকহ শাস্ত্রবিশারদগণ বলেছেন: (المفتي موقع عن الله سبحانه و تعالى) একজন মুফতী প্রকৃত অর্থে আল্লাহর পক্ষ হতে স্বাক্ষরকারী।[১]

আব্দুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

> لقد أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من الأنصار إن كان أحدهم ليسأل عن المسألة فيردها إلى غيره فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول.
>
> আমি একশত বিশ জন আনসার সাহাবাকে পেয়েছি যাদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হতো। তখন তাদের একজন অপর জনের নিকট যেতে বলতেন। এমনকি এক পর্যায়ে প্রশ্নকারী প্রথম ব্যক্তির কাছেই ফিরে আসতো।[২]

ইমাম আবূ হানীফা রহ, থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

> لولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا يكون له المهنأ وعلي الوزر
>
> যদি আমার এই ভয় না হতো যে, ইলম নষ্ট হয়ে যাবে আর এজন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাকে জবাবদিহিতা করতে হবে, তাহলে আমি কাউকে ফাতওয়া প্রদান করতাম না। কেননা এই ফাত্ওয়ার সুফল প্রশ্নকারী ভোগ করবে আর এর দায়ভার আমাকে বহন করতে হবে।[৩]

---

১. শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নাভাভী, *আল-মাজমু শারহে মুহাযযাব* (জিদ্দা: মাকতাবাতুল ইরশাদ, তারিখবিহীন), ভূমিকা অংশ।

২. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ* (কায়রো: দারু ইবনুল জাওযী, ১৯৯৬খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ৪১২

৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫০

ইমাম মালিক রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, যখন তাকে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হতো, তখন মনে হতো তিনি যেন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন।[৪]

আশ'আছ রহ. মুহাম্মাদ ইবনে সীরিন রহ. -এর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন, যখন তাকে ফিক্‌হ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে অর্থাৎ হালাল হারাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো, তখন তার রং এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে যেত যে, তাঁকে চেনাই যেত না।[৫]

আতা ইবনুস সাইব রহ. বর্ণনা করেন, এমন কিছু ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যখন তাদের কাউকে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হতো, তখন তারা প্রকম্পিত অবস্থায় এর উত্তর প্রদান করতেন।[৬]

সম্মিলিত ইজতিহাদ ফাত্ওয়া প্রদানের মাধ্যমসমূহের একটি। কেননা অনেক সময় ফাতওয়া তলবকারীর প্রতিউত্তরে কয়েকজন মুফতী একত্রিত হয়ে ফাতওয়া প্রদান করেন। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক বিষয়ের শরয়ী বিধান তথা ফাতওয়া নির্ধারণে সম্মিলিত ইজতিহাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অত্র প্রবন্ধে সম্মিলিত ইজতিহাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ইজতিহাদ

ইজতিহাদ (اجتهاد) শব্দটি جهد মূলধাতু থেকে নির্গত। جهد শব্দটির জীম (ج) বর্ণের উপর যবর দিয়ে জাহদুন (جَهد) অর্থ কষ্ট, পরিশ্রম, চেষ্টা। পক্ষান্তরে উক্ত বর্ণের উপর পেশ দিয়ে জুহদুন (جُهد) অর্থ শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা। কোন ব্যক্তি বিশেষ কিছু অন্বেষণ করতে পূর্ণ চেষ্টা ব্যয় করলে বলা হয়- جهد في الأمر جهدا। একইভাবে বলা হয়: اجتهد في الأمر "সে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় পূর্ণরূপে অর্জন করতে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করল।"

ইজতিহাদ (اجتهاد) শব্দের মাঝে (تاء) তা বর্ণ সংযুক্ত হওয়া ভীষণ কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার প্রতি ইঙ্গিত করে। তাই ইজতিহাদ শব্দটি সর্বদা পূর্ণ মনোযোগ ও কঠিন পরিশ্রম করে কোন বিষয় অর্জন করার অর্থে ব্যবহার হয়। এ কারণেই ইজতিহাদ শব্দটি কেবল সেখানেই ব্যবহার হয়, যেখানে কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করতে হয়। এ কারণে বলা হয়: (اجتهد في حمل الرحا) "চাকি (জাঁতা) উঠানোর জন্য সে প্রাণান্ত চেষ্টা ব্যয় করল।" এ কথা বলা শুদ্ধ নয় যে, (اجتهد في حمل النواة) খেজুরের আটি উঠানোর জন্য সে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করল।[৭]

---

৪. মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, *উসূলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু* (বৈরূতঃ দারুল কালাম, ২০১৪খ্রি.), পৃ. ১৬

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৭. দ্র. ইবন মানযূর, *লিসানুল আরব* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৭খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৩৫; ইবন ফারিস, *মুজামু মাকাঈসুল লুগাহ* (বৈরূতঃ দারুল জাইল, ১৯৯১খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৮৬; আল-ফাইয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর* (বৈরূতঃ মাকতাবাতু লিবনান, ১৯৮৭খ্রি.) পৃ. ১০১

অতএব, কথা ও কাজের মাধ্যমে সাধ্যের সবটুকু শ্রম ব্যয় করাকে আভিধানিক অর্থে ইজতিহাদ বলে।

পরিভাষায় ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণ ইজতিহাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। এগুলোর শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের মূল অর্থ প্রায় কাছাকাছি। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

১. আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. [৭৯০-৮৬১ হি] বলেন:

بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقليا كان أم نقليا، قطعيا كان أم ظنيا.

ফকীহ কর্তৃক শরয়ী বিধান আহরণের জন্য সামর্থ্য ব্যয় করা। সে বিধান যুক্তিনির্ভর বা বর্ণনাভিত্তিক, অকাট্য বা ধারণামূলক যাই হোক।[৮]

২. আল্লামা আমিদী রহ. [৫৫১-৬৩১ হি.]-এর ভাষায়:

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس بالعجز عن المزيد فيه.

শরয়ী বিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য এমনভাবে নিজের সামর্থ্য ব্যয় করা যে, এর চেয়ে বেশি শ্রম ব্যয় করতে আত্মা অক্ষম হয়ে যায়।[৯]

৩. আল্লামা তুফী [মৃ. ৭১৬হি.] ইজতিহাদের সংজ্ঞা এভাবে করেছেন:

بذل الجهد في تعريف الحكم الشرعي

শরয়ী হুকুম জানার জন্য শ্রম-সাধনা ব্যয় করা।[১০]

ইজতিহাদ সম্পর্কে লক্ষণীয় দুটি বিষয়:

এক: শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. [১২৬৩-১৩২৮খ্রি.] এ ব্যাপারে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন যে, ইজতিহাদ মৌলিক ও শাখাগত উভয় বিষয়ে হতে পারে। তিনি বলেন: "পূর্বসূরী ও ইমামদের মাঝে কেউই দীনের মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করেননি। বরং দীনকে মৌলিক ও শাখাগত এ দুই ভাগে বিভক্ত করার বিষয়টি সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগে ছিলই না। সাহাবা, তাবেয়ীন ও পূর্বসূরীদের মাঝে কেউই এ কথা বলেননি যে, মুজতাহিদ যদি তার সম্পূর্ণ সামর্থ্য

---

৮. কামাল ইবনুল হুমাম, *আত-তাহরীর ফী উসূলিল ফিকহ* (মিসর: মাতবায়াতে মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী, তারিখবিহীন) পৃ. ৫২৩

৯. সাইফুদ্দীন আল-আমিদী, *আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০১১খ্রি.) খ. ৪, পৃ. ৩৯৬

১০. নজমুদ্দীন আল-তুফী, *শরহু মুখতাসারির রাওযাহ* (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৭খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৭৬

সত্য অন্বেষণের জন্য ব্যয় করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে; না দীনের মৌলিক বিষয়ে আর না শাখাগত বিষয়ে। বরং তারা উবাইদুল্লাহ আল-আনবারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: (كل مجتهد مصيب) "প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত"। অর্থাৎ তিনি গুনাহগার হবেন না। এটাই ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ীসহ অধিকাংশ ইমামদের মত।[১১]

দুই: আল্লামা তুফী ইজতিহাদকে পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। পূর্ণাঙ্গ ইজতিহাদ বলতে যেখানে আর বেশি সামর্থ্য ব্যয় সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে অপূর্ণাঙ্গ ইজতিহাদ হলো, কোন বিধান জানার জন্য সাধারণ গবেষণা করা। অবস্থার ভিন্নতার কারণে তার স্তরেও ভিন্নতা আসতে পারে।[১২]

এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, অপূর্ণাঙ্গ ইজতিহাদও আল্লাহর নিকট গ্রহণীয়। আল্লামা তুফী রহ. তার উপরোক্ত কথার মাধ্যমে এ বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন যে, দীর্ঘ গবেষণা, ধৈর্য্য, প্রচেষ্টা ও দৃঢ়তার দিক থেকে মুজতাহিদদের স্তরের ব্যবধান হয়ে থাকে। এ কারণে মুজতাহিদের উপর এটা আবশ্যক নয় যে, সকল বিষয়ের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। যেমনটি তিনি এ ব্যাপারে বাধ্য নন যে, তাকে এ মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হবে। কেননা এটা তার সাধ্যের বাইরে। তাছাড়া অনেক সময় মাসআলা জটিল হয় এবং তার ইল্লত (কার্যকারণ) অস্পষ্ট হয়। আর এ ব্যাপারে ইজমা কায়েম হয়েছে যে, মুজতাহিদ কখনো কখনো ভুল করতে পারে। তিনি বিধান অন্বেষণের ক্ষেত্রে সঠিক; যদিও কাঙ্ক্ষিত মাসআলার সঠিক সমাধানে পৌঁছতে ভুলের স্বীকার হতে পারেন। তাছাড়া ইজতিহাদের জন্য কিছু স্বভাবগত যোগ্যতারও প্রয়োজন। যেমন সুবুদ্ধি,তীক্ষ্ম মেধা ইত্যাদি।

সম্মিলিত ইজতিহাদ

সম্মিলিত ইজতিহাদ (আল-ইজতিহাদুল জামায়ী/الاجتهاد الجماعي) একটি সাম্প্রতিক পরিভাষা। কেননা পূর্ববর্তীদের মধ্যে এ শিরোনামে কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। তবে কর্মচর্চার দিক থেকে ইসলামী শরীয়াহর ইতিহাস এমন কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে, স্বরূপগত দিক থেকে যা সম্মিলিত ইজতিহাদ। যদিও তাকে এ নামে নামকরণ করা হয়নি। নিম্নে সম্মিলিত ইজতিহাদের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

১. ড. শা'বান ইসমাঈল এর ভাষায় সম্মিলিত ইজতিহাদ এর সংজ্ঞা:

الذي يتشاور فيه أهل العلم في القضايا المطروحة، وخصوصا فيما يكون له طابع العموم ويهم جمهور الناس.

---

১১. ইবন তাইমিয়া, *মাজমূউল ফাতাওয়া*, সংকলন ও বিন্যাস: আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০৬খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ১২৫

১২. আল-তুফী, *শরহু মুখতাসারির রাওযাহ*, খ. ৩, পৃ. ৫৭৬

সম্মিলিত ইজতিহাদ ঐ ইজতিহাদকে বলা হয়, যাতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে বিজ্ঞ আলিমগণ পরস্পর একে অপরের সাথে পরামর্শ ও পর্যালোচনা করে থাকেন, বিশেষ করে এমন সমস্যার সমাধান কল্পে, যা ব্যাপক রূপ লাভ করে এবং জনমানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলে।[১৩]

২. ড. আব্দ আল-খলীল বলেন:

اتفاق أغلب المجتهدين من أمة محمد في عصر من العصور على حكم شرعي في مسألة.

কোন মাসআলার শরয়ী বিধান সম্পর্কে কোন এক যুগে উম্মতে মুহাম্মাদীর অধিকাংশ মুজতাহিদগণের ঐকমত্য।[১৪]

৩. ড. আব্দুল মাজীদ শারাফী বলেন:

استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظن بحكم شرعي بطريق الاستنباط، واتفاقهم جميعا أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور.

গবেষণা ও উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে কোন শরয়ী বিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য অধিকাংশ ফকীহের প্রচেষ্টা ব্যয় করা এবং পরামর্শের ভিত্তিতে তাঁদের সকলের অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের একমত হওয়া।[১৫]

৪. "ইসলামী বিশ্বে সম্মিলিত ইজতিহাদ" শীর্ষক সেমিনারে একে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে:

اتفاق أغلبية المجتهدين في نطاق مجمع أو هيئة أو مؤسسة شرعية ينظمها ولي الأمر في دولة إسلامية على حكم شرعي عملي لم يرد به النص قطعي الثبوت والدلالة بعد بذل غاية الجهد فيما بينهم في البحث والتشاور.

মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে শরীয়াহ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংগঠনের অধীনে কোন ব্যবহারিক বিষয়ের, যার বিধানের ব্যাপারে অকাট্য কোন সূত্র বা নির্দেশনা পাওয়া যায় না তার শরয়ী বিধান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মুজতাহিদগণের গবেষণা ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করে তাদের অধিকাংশের একমত হওয়া।[১৬]

---

১৩. শা'বান ইসমাঈল, *আল-ইজতিহাদুল জামাঈ ও দাওরুল মাজামিয়িল ফিকহিয়্যাহ ফী তাতবীকিহী* (বৈরূত: দারুল বাশাঈর, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ২১

১৪. আল-আবদ আল-খালীল, "আল-ইজতিহাদুল জামাঈ ও আহাম্মিয়্যাতুহু ফিল আসরিল হাদীস", *মাজাল্লাতু দিরাসাতিল জামি'আ আল-উরদুনিয়্যাহ*, পৃ. ২১৫

১৫. আব্দুল মাজীদ শারাফী, *আল-ইজতিহাদুল জামাঈ ফিত তাশরীইল ইসলামী* (দোহা: আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কাতার, কিতাবুল উম্মাহ সিরিজ ৬২, ১৪১৮হি.), পৃ. ৪৬

১৬. দ্র. সম্মিলিত ইজতিহাদ সেমিনারের গবেষণাপত্র, খ. ২ পৃ. ১০৭৯, সূত্র: কুতুব মুস্তাফা শানু, *আল-ইজতিহাদুল জামাঈ আল-মানশুদ ফী দুয়িল ওয়াকে আল-মুআসির* (বৈরূত: দারুন নাফাঈস, ২০০৬খ্রি.), পৃ. ২৮

৫. ড. কুত্বুব মুস্তফা সানু বলেন:

العملية العلمية المنهجية المنضبطة التي يقوم بها مجموع الأفراد الحائزين على رتبة الاجتهاد في عصر من العصور من أجل الأصول إلى مراد الله في قضية ذات طابع عام تمس حياة أهل قطر أو إقليم أو عموم الأمة، أو من أجل التوصل إلى حسن تتريل لمراد الله في تلك القضية ذات الطابع العام على واقع المجتمعات والإقليم والأمة.

সম্মিলিত ইজতিহাদ এমন এক নিয়মতান্ত্রিক সমন্বিত ইলমী প্রয়াস, যা কোন যুগের ইজতিহাদের স্তরে উন্নীত একদল বিজ্ঞ ব্যক্তি সম্পন্ন করেন কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা গোটা উম্মতের জীবনঘনিষ্ঠ কোন বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা অবগত হওয়ার প্রয়াসে। অথবা আল্লাহর ইচ্ছার ভিত্তিতে সমাজ, অঞ্চল ও উম্মাহর বাস্তব অবস্থার আলোকে উক্ত সর্বব্যাপী সমস্যার যুগোপযোগী সুন্দর প্রয়োগপদ্ধতি বর্ণনা করা।[১৭]

পর্যালোচনা

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করলে যেসব বিষয় স্পষ্ট হয় তা নিম্নরূপ:

১. প্রথম সংজ্ঞায় বলা হয়েছে "উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে" এ কথাটি অপ্রয়োজনীয়। কেননা যে কোন শরয়ী বিধান সম্বন্ধে মুজতাহিদগণের গবেষণা ও পর্যালোচনার দ্বারাই সম্মিলিত ইজতিহাদ হতে পারে। তার জন্য উদ্ভূত সমস্যা হওয়া শর্ত নয়।

২. "এমন সমস্যা যা ব্যাপক রূপ লাভ করে এবং জনমানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলে" এ শর্তটি আবশ্যক নয়। কারণ, যদি এমন মাসআলা সম্বন্ধে সম্মিলিত ইজতিহাদ করা হয়, যা কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত, সামষ্টিক জনগোষ্ঠীর জন্য তা প্রযোজ্য নয়, তবুও তাকে সম্মিলিত ইজতিহাদই বলা হবে।

৩. "অধিকাংশ ফিক্হবিদ" "অধিকাংশ মুজতাহিদ" এ জাতীয় শর্ত করাও উচিত নয়। কারণ:

ক. "অধিকাংশ ফিক্হবিদ" বা "অধিকাংশ মুজতাহিদ" এর একই স্থানে একত্রিত হওয়া প্রায় অসম্ভব বলা চলে।

খ. আর সংখ্যালঘু মুজতাহিদগণ যারা একমত হননি তাদের ইজতিহাদকেও সম্মিলিত ইজতিহাদই বলা হবে।

গ. এমনিভাবে যদি একদল ফিক্হশাস্ত্রবিদ যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার আওতায় পড়েন না ইজতিহাদ করেন তবে তাদের সে ইজতিহাদকেও সঠিক অর্থে সম্মিলিত ইজতিহাদ বলা হবে।

---

১৭. মুস্তাফা শানু, *আল-ইজতিহাদুল জামাঈ আল মানশুদ*, পৃ. ৫৩

৪. "শরয়ী বিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য" এ কথাটিও আপত্তিকর। কেননা ইজতিহাদের মাধ্যমে মুজতাহিদের যেমন ধারণাপ্রসূত জ্ঞান অর্জিত হয়, তেমনি নিশ্চিত জ্ঞানও অর্জিত হয়।

৫. "মুজতাহিদগণের একমত হওয়া" এ কথাটি সম্মিলিত ইজতিহাদের সারমর্ম বহির্ভূত। কেননা একমত হওয়া এই ইজতিহাদের একটি ফলাফল। আর কোন কাজ এবং তার ফলাফলের মাঝে পার্থক্য থাকার বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট। তাছাড়া সম্মিলিত ইজতিহাদ পূর্ণ হওয়ার জন্য মুজতাহিদগণের একমত হওয়া শর্ত নয়। বরং তাঁরা যদি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারেন অথবা তাদের প্রচেষ্টাকে স্থগিত করেন তাহলে তাকেও সম্মিলিত ইজতিহাদ বলা যায়।

৬. "কোন প্রতিষ্ঠান,সংস্থা বা সংগঠন এর অধীনে" সম্মিলিত ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এ অংশটিও শর্ত নয়। তাইতো যদি একদল ফিকহ্শাস্ত্রবিদ মিলে ইজতিহাদ করেন যারা কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংগঠন এর সাথে সম্পৃক্ত নন তাদের সে সম্মিলিত ইজতিহাদকে আল-ইজতিহাদুল জামাঈ বলা যাবে।

৭. "মুসলিম রাষ্ট্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে" এ কথাটিও আপত্তিকর। কেননা সম্মিলিত ইজতিহাদ অস্তিত্বে আসার জন্য মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তির তত্ত্বাবধান আবশ্যক নয়। তবে এই সম্মিলিত ইজতিহাদকে কারো উপর আবশ্যক করে দেয়া এটি একটি ভিন্ন বিষয়; যা সম্মিলিত ইজতিহাদের সারবস্তু ও মৌলিক উপাদান বহির্ভূত। এমনিভাবে সম্মিলিত ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তা মুসলিম রাষ্ট্রে হওয়াও জরুরী নয়। যদি কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে বা সংখ্যালঘু কোন মুসলিম দেশে ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ একত্রিত হয়ে ইজতিহাদ করেন তাহলে তাকেও সম্মিলিত ইজতিহাদ বলা যাবে।

৮. "যার বিধানের ব্যাপারে অকাট্য কোন সূত্র বা নির্দেশনা পাওয়া যায় না" এ কথাটিও আপত্তিকর। কেননা এর মাধ্যমে মাসাআলার 'তাহকীকুল মানাত' তথা বিধানের মূল উদ্দেশ্য বিশ্লেষণের বিষয়টি পৃথক হয়ে যায়; অথচ এ বিষয়ের ইজতিহাদও একটি স্বীকৃত ইজতিহাদ।

৯. "আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা" এ কথাটিও আপত্তিমুক্ত নয়। কেননা মুজতাহিদগণ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তা তাদের ব্যক্তিগত মতামত। এ মতামত যদিও গ্রহণযোগ্য; তবুও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে , এটিই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা। আবূ বকর রা.-কে কালালাহ (মাতা-পিতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) সম্বন্ধে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

اقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمن نفسي والشيطان واستغفر الله

এ ব্যাপারে আমি আমার মতামত প্রদান করছি। যদি তা সঠিক হয় তবে তার প্রশংসা আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য, আর যদি ভুল হয় তবে এর দায় আমার ও শয়তানের। আর আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সমকালীন কয়েকজন বিজ্ঞ আলেম কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা পর্যালোচনার পর বলা যায়, "কোন শরয়ী বিধান আহরণের উদ্দেশ্যে একদল বিজ্ঞ ফকীহের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যয় করাকে আল-ইজতিহাদুল জামাঈ বা সম্মিলিত ইজতিহাদ বলে।"

প্রদত্ত এই সংজ্ঞার মাঝে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, যা একে অন্য সব সংজ্ঞা থেকে পৃথক করেছে। সেগুলো হলোঃ

১) সম্মিলিত ইজতিহাদ এর জন্য কিছু সংখ্যক সদস্যের প্রয়োজন, যাদেরকে একটি জামা'আত বা দল বলা যায়। তার সর্বনিম্ন সংখ্যা দুই থেকে তিনজন। আর সদস্য সংখ্যা যত বেশি হবে তার উপকারিতা এবং সে সিদ্ধান্তের প্রতি আত্মতৃপ্তির মাত্রা ততই বৃদ্ধি পাবে।

২) ইজতিহাদের সময় মুজতাহিদগণের একত্রিত হওয়াও একটি জরুরী বিষয়। এই একত্রিত হওয়ার বিষয়টি যেমন সকলে এক জায়গায় বসে হতে পারে, তেমনি আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন স্কাইপি, ভিডিও কল, ফোন ইত্যাদি প্রযুক্তির) ব্যবহারের মাধ্যমেও হতে পারে; যাকে এক সাথে বসার আওতায় ধরা যায়।

৩) এই ইজতিহাদের লক্ষ্য হলো, শরয়ী বিধান আহরণ করা। সে বিধান হতে পারে জনমানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অথবা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। আর এ সম্মিলিত ইজতিহাদ-এর জন্য কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংগঠন-এর অধীনে কাজ করা বা বিশেষ কোন আনুষ্ঠানিকতা শর্ত নয় । তবে এসব বিষয়ের সন্নিবেশ উত্তম।

৪) বর্তমান যুগে বিভিন্ন ফিকহী সেমিনার, ফিকহী বোর্ড ও ইফতা বিভাগ এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার আওতাধীন যে সব সম্মিলিত ইজতিহাদ হচ্ছে তা একথার প্রমাণ বহন করে যে, ইজতিহাদ শুধুমাত্র দীনী বিধান ও ফিকহী মাসায়েলের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ঈমান-আক্বীদা, দীনের মৌলিক বিষয়াদি যেমন- বিভিন্ন বাতিল ফিরকার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান বর্ণনা, আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম ও কুরআনের প্রতি কাফের-মুশরিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের সৃষ্ট সংশয় ও বিষোদগারের জবাব এবং বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদ এর মাঝে তুলনামূলক বিশ্লেষণ ইত্যাদিও এই ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

ফাত্ওয়া

সম্মিলিত ইজতিহাদের আলোচনার ক্ষেত্রে ফাতওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসংগ বিধায় নিম্নে ফাতওয়া বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফাত্ওয়া (فتوى) শব্দটি একবচন। তাকে ফুতওয়া ও ফুতইয়াও বলা যায়। এর বহুবচন ফাতাওয়া (فتاوى)।[১৮] ফাত্ওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা। সে প্রশ্ন হতে পারে শরয়ী বিধান সম্পর্কে বা অন্য কোন বিষয়ে। যেমন মহান আল্লাহ মিসরের বাদশাহর কথা বর্ণনা করেছেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾

> হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।[১৯]

একইভাবে সাবা অঞ্চলের রাণীর কথা বর্ণনা করেছেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾

হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও।[২০]

এই উভয় স্থানে ফাতওয়া শব্দটি এমন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যা শরয়ী বিধান সংশ্লিষ্ট নয়।

কখনো ফাতওয়া শব্দটি শরয়ী বিধান সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾

> আর লোকেরা তোমার নিকট নারীদের বিষয়ে শরয়ী বিধান জানতে চায়। বল, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের ব্যপারে শরয়ী বিধান জানাচ্ছেন...।[২১]

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾

> আর লোকেরা তোমার নিকট শরয়ী বিধান জানতে চায়। বল, মাতা-পিতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে শরয়ী ব্যবস্থা জানাচ্ছেন...।[২২]

---

১৮. ইবন মানযূর, *লিসানুল আরব*, খ. ১৫, পৃ. ১৪৭-১৪৮
১৯. আল-কুরআন, ১২ : ৪৩
২০. আল-কুরআন, ২৭ : ৩২
২১. আল-কুরআন, ০৪ : ১২৭
২২. আল-কুরআন, ০৪ : ১৭৬

পরিভাষায় ফাত্ওয়ার বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে। এর মধ্যকার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি:

১. ইবন হামদান বলেন:

الإخبار بحكم الله تعالى عن الوقائع بدليل شرعي.

কোন ঘটনার ব্যাপারে শরয়ী দলীল এর ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলার হুকুম সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া।[২৩]

২. ইমাম কারাফী বলেন:

إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة.

কোন কাজ আবশ্যক বা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সংবাদ দেয়া।[২৪]

৩. ড. আব্দুল্লাহ আল-তুর্কী বলেন:

ما يخبر به المفتي جوابا لسؤال أو بيانا لحكم من الأحكام وإن لم يكن سؤالا خاصا.

মুফতী কোন প্রশ্নের উত্তরে অথবা বিশেষ কোন প্রশ্ন ছাড়াই কোন বিধান বর্ণনার জন্য যে সংবাদ প্রদান করেন তাকে ফাত্ওয়া বলে।[২৫]

৪. ড. হুসাইন আল-মাল্লাহ বলেন:

الإخبار بحكم الله تعالى عن الوقائع بدليل شرعي لمن سأل عنه.

কোন ঘটনার ব্যাপারে প্রশ্নকারীকে শরয়ী দলীল এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার হুকুম সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া।[২৬]

৫. সবচেয়ে ব্যাপক সংজ্ঞা হলো:

الإخبار بالحكم الشرعي لمن سأل عنه بلا إلزام

প্রশ্নকারীকে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ব্যতীত শরয়ী বিধান বলে দেওয়া।[২৭]

এ সংজ্ঞা ব্যবহারিক, বিশ্বাসগত, জ্ঞানমূলক সকল বিষয়ের শরয়ী মাসআলাকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে তা আদালতের ফয়সালাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

---

২৩. ইবন হামদান, *সিফাতুল ফাতওয়া ওয়াল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী* (বৈরূত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী), পৃ. ৪

২৪. শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন ইদরীস আল-কারাফী, *আল-ফুরূক* (বৈরূত: দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৫৩

২৫. আব্দুল্লাহ আল-তুর্কী, *উসূলু মাজহাবিল ইমাম আহমদ* (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ), পৃ. ৭২৫

২৬. হুসাইন আল-মাল্লাহ, *আল-ফাতওয়া: নাশাতুহা, তাতাওয়ুরুহা, উসূলুহা ওয়া তাতবীকাতুহা* (বৈরূত: আল-মাকতাবাহ আল-আসরিয়্যাহ, ১৪২২হি.), খ. ১, পৃ. ৩৯৮

২৭. সালিহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হুমাইদ, "আল-ইজতিহাদ আল-জামায়ী ওয়া আহমিয়্যাতুহু ফী নাওয়াযিলিল আসর", মাজাল্লাতুল মাজমাইল ফিকহী আল-ইসলামী, বর্ষ ২৩, সংখ্যা ২৫, পৃ. ৬২

ফাত্ওয়া ও সম্মিলিত ইজতিহাদের মধ্যকার সম্পর্ক

সম্মিলিত ইজতিহাদের উপরিউক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ফাত্ওয়া ও সম্মিলিত ইজতিহাদের মাঝে সম্পর্ক হলো অসীলা (মাধ্যম) ও নতীজা (ফলাফল) এর সম্পর্ক। অর্থাৎ,সম্মিলিত ইজতিহাদ ফাত্ওয়ার মাধ্যমসমূহের একটি। যেমন ফাত্ওয়া সম্মিলিত ইজতিহাদের ফলাফলসমূহের একটি। সুতরাং, সম্মিলিত ইজতিহাদ হলো মাধ্যম আর ফতওয়া হলো তার ফলাফল।

তাছাড়া ফাত্ওয়া ও সম্মিলিত ইজতিহাদের মাঝে কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। আবার কিছু বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে।

সাদৃশ্যের দিকসমূহ

১. উভয়টির মাঝেই শরয়ী মাসআলা সম্পর্কে গবেষণা ও পর্যালোচনা হয়।
২. এ গবেষণা ও পর্যালোচনার জন্য প্রশ্নকারী বা সম্পৃক্ত ব্যক্তির অনুমতির প্রয়েজন হয় না।
৩. কোন যুগে একই মাসআলা সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের ফাত্ওয়া ও সম্মিলিত ইজতিহাদ হতে পারে।
৪. এ দুটি সর্বসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত বা কোন ব্যক্তি বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে হতে পারে।
৫. মৌলিকভাবে এর মাধ্যমে কাউকে কোন কাজে বাধ্য করা হয় না বা চাপ প্রয়োগ করা হয় না। তবে পরিবেশ-পরিস্থিতি বা অন্য কোন কারণে বাধ্যবাধকতা আসতে পারে।

বৈসাদৃশ্যসমূহ

১. সম্মিলিত ইজতিহাদ ফাত্ওয়া প্রদানের মাধ্যমসমূহের একটি। কেননা ফাত্ওয়া কখনো এক ব্যক্তি কর্তৃক প্রদান করা হয়। আবার কখনো কোন জামাআত বা দলের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। আর জামাআতের পক্ষ থেকে ফাতওয়া কখনো সকল সদস্যের একমত হওয়ার পর বা সকলের সাথে পরামর্শ করার পর প্রদান করা হয়। সুতরাং ফাত্ওয়া সম্মিলিত ইজতিহাদের ফলাফল।
২. সম্মিলিত ইজতিহাদ কখনো এক ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে না। আর ফাত্ওয়া এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রদান করা যায়।
৩. অকাট্যভাবে শরয়ী বিধান সাব্যস্ত হয়েছে এমন বিষয়েও ফাত্ওয়া প্রদান করা হয়। তাই তাতে নিজের সবটুকু সামর্থ্য ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সম্মিলিত ইজতিহাদ কখনো অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হওয়া মাসআলা সম্পর্কে হতে পারে না। কেননা সেখানে ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই।

৪. বিবদমান মাসআলা সম্পর্কে সম্মিলিত ইজতিহাদ করা যায়, কিন্তু ফাত্ওয়া প্রদান করা যায় না।

৫. প্রশ্নকারীর কাছে শরয়ী বিধান পৌঁছানোর পূর্বে ফাত্ওয়ার কার্যক্রম প্রদান সম্পন্ন হয় না। তবে ইজতিহাদ শুধুমাত্র শরয়ী বিধান উদ্ভাবনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে যায়।

ফাতওয়ার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, সম্মিলিত ইজতিহাদ ফাত্ওয়া প্রদানের অসীলা ও মাধ্যমসমূহের একটি। বাস্তবিক অর্থে সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে বর্তমান যুগে ফাত্ওয়ার সংরক্ষণ ও ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বাড়াবাড়ি, কঠোরতা ও শিথিলতা পরিহার করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই গুরুত্বের দিকটি নিম্নের আলোচনা দ্বারা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করি।

ক. সম্মিলিত ইজতিহাদ, বিশেষ করে যা কোন ফিকহী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অধীনে পরিচালনা করা হয় তাকে বিজ্ঞ মুজতাহিদ, বিদগ্ধ ফকীহগণের সম্মিলিত গবেষণা ও পারস্পরিক পর্যালোচনার ফলাফল ধরা হয়ে থাকে। এখানে একটি মাসআলার বিভিন্ন দিক নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, পারস্পরিক মত বিনিময় ইত্যাদির সমাবেশ ঘটে। একারণে তা অপেক্ষাকৃত বেশি সঠিক, অধিক গ্রহণীয় ও পরিতৃপ্তির কারণ হয়। কারণ এ বিষয়টি একবারেই স্পষ্ট যে, একটি জামাআতের সিদ্ধান্ত একজন ব্যক্তির সিদ্ধান্তের তুলনায় বেশি সঠিক; যদিও সে একজনের জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়। কেননা, কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা অস্পষ্ট বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করে তুলে, বিস্মৃত বিষয়সমূহকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং দুর্বোধ্য বিষয়সমূহকে নিমিষেই সহজ করে দেয়। অন্য ভাষায় বলতে গেলে সম্মিলিত ইজতিহাদের মাঝে বিভিন্নজনের মতামত তাঁদের দলীল প্রমাণের ব্যাপারে গভীর পর্যালোচনার সুযোগ হয়। যার ফলে তা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত হয় অধিক সূক্ষ্ম ও সঠিক।

সম্মিলিত ইজতিহাদের এ বিশেষত্বের কারণেই আমাদের পূর্ববর্তী অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ, যাদের মাঝে অন্যতম হলেন খুলাফায়ে রাশেদীন, সম্মিলিত ইজতিহাদের প্রতি- যা পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হতো- খুব বেশী আগ্রহী ছিলেন। বিশেষ করে ঐ সকল জটিল মাসআলা সম্পর্কে, যা মানুষের মাঝে ব্যাপক রূপ লাভ করেছিল। হাদীসের কিতাবে এর বহু নজির রয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

খ. এ যুগে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উচ্চতর গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। একজন আলিম ভাষা, ফিকহ, হাদীস তাফসীর এবং মূলনীতি এগুলোর কোন একটি

বিষয় সম্বন্ধে পারদর্শী হন। এক পর্যায়ে তা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, এমন একজন বিজ্ঞ আলেম খোঁজে পাওয়া কঠিন, যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন এবং তার থেকে সাধারণ সকল মাসআলার সঠিক সমাধান পাওয়া যায়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সম্মিলিত ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটে। আর এসব কিছুর সমন্বয়ে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়, যা বিশুদ্ধতা ও যথার্থতার অতি নিকটবর্তী এবং ভুল-ত্রুটি থেকে অধিক দূরবর্তী। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও ফাত্ওয়া প্রদানের অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনভিজ্ঞ লোকদেরকে ফাত্ওয়া প্রদানের অনধিকার চর্চা থেকে বাধা প্রদান এবং বিদগ্ধ মুজতাহিদদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করার দ্বারা সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গ. এ যুগে এমন অনেক আধুনিক প্রযুক্তির আবিষ্কার হয়েছে, যা সামগ্রিক জীবনের বহু দিক ছেয়ে ফেলেছে। আর এতে করে মানুষের মাঝে এমন অনেক নিত্য-নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে কখনোই ছিল না। তাছাড়া পূর্ববর্তী লেখকগণের রচিত গ্রন্থসমূহে এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোর নজিরও মেলে না। এ নজির না মেলার দুটি কারণ হতে পারে:

১. এ সমস্যাগুলো এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, কখনো কোন জাতি, দেশ আবার কখনো গোটা মুসলিম জাতিই এর সম্মুখীন হচ্ছে ।
২. এ বিষয়গুলো কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের আওতাধীন নয়; বরং বিভিন্ন বিষয়ের শাখা প্রশাখার সাথে জড়িত। যে কারণে তার মর্ম উদ্ধার ও সারবস্তু উপলব্ধি করা জটিল হয়ে পড়ে।

এ সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ফাত্ওয়া প্রদানের সময় এ দুটি বিষয় খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখা উচিৎ। কেননা ব্যাপক ফাতওয়ার মাঝে যদি কোন ভুল-ত্রূটি থেকে যায়, তাহলে এর প্রভাব সর্বসাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবেই পড়ে। যেমন অসম্পূর্ণ গবেষণা প্রসূত ফাত্ওয়া অসম্পূর্ণই হয়ে থাকে। তাই এ জাতীয় আধুনিক বিষয়ে ফাত্ওয়া প্রদান সম্মিলিত ইজতিহাদের দাবী করে। যেখানে বিভিন্ন সাবজেক্ট-এ ব্যুৎপত্তির অধিকারী একটি জামাআতের সম্মিলিত গবেষণার সুযোগ হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও ফাতওয়ার সংরক্ষণ ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার ক্ষেত্রে সম্মিলিত ইজতিহাদের বিরাট ভূমিকার কথা সহজেই অনুমেয়।[২৮]

---

[২৮]. শারাফী, *আল-ইজতিহাদ আল-জামাঈ*, পৃ. ৭৭-৯২; ইসমাঈল, *আল-ইজতিহাদ আল-জামাঈ*, পৃ. ১১৯-১২২; আল-খলীল, *আল-ইজতিহাদ আল-জামাঈ*, পৃ. ২২৬-২২৯

সম্মিলিত ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ফিকহ একাডেমিসমূহের ভূমিকা

হিজরী চতুর্দশ এর শুরু থেকে চিন্তাশীল বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম সম্মিলিত ইজতিহাদকে আরো কার্যকরী করতে ও তার বিকাশ ঘটাতে শরয়ী গবেষণা সংস্থা, ফিক্হ বোর্ড, ইলমী সেমিনার ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছেন এবং নিজেরাও এর আয়োজন করে যাচ্ছেন; যেখানে মুজতাহিদগণ গবেষণার মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে উদ্ভূত নিত্য নতুন ও আধুনিক জটিল সমস্যার সমাধান প্রদান করে যাচ্ছেন। সে সকল মান্যবর উলামায়ে কেরাম যারা সম্মিলিত ইজতিহাদের প্রতি জোরালো ভাবে আহব্বান করে গিয়েছেন তাদের একজন হলেন, শাইখ মুহাম্মাদ তাহির ইবনে আশুর রহ: [১৮৭৯-১৯৭৩]। তিনি বলেছেন, "উম্মতের উপর পরিবেশ-পরিস্থিতির চাহিদার নিরিখে ইজতিহাদ করা ফরযে কিফায়া। সামর্থ্য ও সাজ-সরঞ্জাম মজুদ থাকা সত্ত্বেও যদি উম্মত এ ব্যাপারে অবহেলা করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবেন। এ যুগে উলামায়ে কেরামের উপর কমপক্ষে এতটুকু তো আবশ্যক যে, তারা সকলে মিলে একটি ইলমী গবেষণাগারের আয়োজন করবেন। যেখানে মুসলিম ভূখণ্ড সমূহের মধ্য হতে শরীয়ত সম্বন্ধে সবচেয়ে বিজ্ঞ আলেমগণ মাযহাবের ভিন্নতাকে উর্ধে রেখে একত্রিত হবেন এবং সকলে মিলে উম্মতের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হবেন। সকলে মিলে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করবেন, যার উপর উম্মতের আমল চালু হয়ে যায়। পৃথিবীর যে প্রান্তেই মুসলমান বসবাস করে সেখানেই তাদের সিদ্ধান্তসমূহ পৌঁছে দিবেন। আমার ধারণা, কেউ তাদের সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অসম্মত হবেন না। দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ঐ সকল আলিমের নাম তালিকাভুক্ত করবেন, যারা ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছে গিয়েছেন অথবা তার কাছাকাছি অবস্থান করছেন। আর সাধারণ আলিমগণের কর্তব্য হল, তাদের মাঝে যারা গভীর জ্ঞান রাখেন, শরীয়তের উদ্দেশ্য বুঝে যারা সঠিকভাবে গবেষণা করতে পারেন তাদের ব্যাপারে ইজতিহাদের যোগ্য বলে সাক্ষ্য দেয়া। সেই সাথে এ বিষয়টিও জরুরী যে, তাদের শরীয়ত সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পাশাপাশি সততা, নিষ্ঠা ও শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণের গুণেও গুণান্বিত হতে হবে। যাতে করে ইলমের আমানতের গুণ তাদের মাঝে পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে। মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণকামিতা করতে গিয়ে তাদের মাঝে কোন পিছু টান না পড়ে।[২৯]

ড: মুহাম্মাদ ইউসুফ মূসা বলেন: "আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এখন এ সময় এসেছে যে, আমাদের মাঝে আরবী ভাষা প্রশিক্ষণ একাডেমির পাশাপাশি ইসলামী ফিক্হ বোর্ড থাকবে। কেননা ফিক্হ বোর্ড প্রতিষ্ঠা ব্যতীত প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের আবশ্যকীয় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।"[৩০]

---

[২৯] মুহাম্মাদ তাহির ইবনে আশুর, *মাকাসিদুশ শরীআহ আল-ইসলামিয়্যাহ* (আম্মান: দারুন নাফাঈস, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.), পৃ. ৪০৮-৪০৯

[৩০] মুহাম্মাদ ইউসুফ মূসা, *তারিখুল ফিকহিল ইসলামী* (কায়রো: মাতাবিই দারিল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৫৮খ্রি.), পৃ. ১৮

হযরত মুস্তফা আহমাদ যারকা বলেন: "যদি আমরা শরীয়ত এবং তার ফিকহ শাস্ত্রকে পুনর্জীবন দান করতে চাই, তাহলে ঐ ইজতিহাদকে যা ওয়াজিব আলাল কিফায়া উম্মতের মাঝে চালু রাখতে হবে। আর এটাই উম্মতের মাঝে নিত্য নতুন যে সমস্যা তৈরি হচ্ছে তার গভীর গবেষণা, মজবুত দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে সমাধানের একমাত্র উপায়। যাতে সংশয়-সন্দেহের অবকাশ একবারেই ক্ষীণ এবং যা স্থবির চিত্ত-চেতনাকে সচল করে তুলে। আর এর বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুটি মৌলিক বিষয় আবশ্যক। ১. প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান ২. শিক্ষার উপর আরো জোর প্রদান। প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের পদ্ধতি হল- আরবী ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বিশ্ব ফিকহ বোর্ড গঠন করা, যার তত্ত্বাবধানে সম্মিলিত ইজতিহাদ, ফিকহী সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা হবে।[৩১]

এ আহক্ষান মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছে এবং বিশ্ব জুড়ে উচ্চতর গবেষণামূলক বহু ফিকহী বোর্ড, সংস্থা, সংগঠন ও ইলমী সেমিনার অস্তিত্বের মুখ দেখেছে। আমরা এখানে এমন কিছু সংস্থা ও সংগঠনের কথা উল্লেখ করছি।

১. مجمع البحوث الإسلامي في الأزهر (মাজামাউল বুহুসিল ইসলামী, জামিআ আযহার (মিসর)

এ সংস্থাটি ১৩৮১হি: তে এমন একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারী করে, যা ইসলামী বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা করবে এবং মুসলমানদের মাঝে যে মাযহাবভিত্তিক বা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে সে ব্যাপারে সঠিক মতামত প্রদান করবে। বিভিন্ন মাযহাব থেকে নির্বাচিত পঞ্চাশ জন সদস্য বিশিষ্ট বিজ্ঞ আলিমের সমন্বয়ে এ বোর্ড গঠিত হবে। তাদের মাঝে মিসরের বাইরের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২০ জনের বেশি হবে না। কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক সদস্য অন্য সকল ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র সংস্থার কাজে নিয়োজিত থাকবে। জামিআ আযহারের প্রধান শাইখ পদাধিকার বলে এ সংস্থার সভাপতি বিবেচিত হবেন। এ সংস্থার প্রথম সম্মেলন কায়রোতে ১৩৮২ হি: তে অনুষ্ঠিত হয়।

২. هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (হাইআতু কিবারিল উলামা ফিল মামলাকাতিল আরাবিয়্যাহ আসসাউদিয়্যাহ)

সৌদি সরাকারের এক রাজকীয় ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৩৯১ হিজরীতে এ সংস্থা গঠিত হয়। এর প্রধান কাজ হলো, রাষ্ট্রনায়কের পক্ষ থেকে যে সকল বিষয় নিয়ে গবেষণার নির্দেশ দেয়া হবে তা নিয়ে গবেষণা, এ ব্যাপারে সংস্থার মতামত প্রদান এবং সে সকল মতামতের পক্ষে শরয়ী দলীল উপস্থাপন। প্রতি ছয় মাস পর পর এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে সৌদি আরবের প্রধান মুফতী সভাপতিত্ব করেন। এ

---

৩১. মুস্তফা আহমাদ যারকা, *আল-ইজতিহাদ ওয়া দাওরুল ফিকহ ফী হাল্লিল মুশকিলাত* (আম্মান: জমঈয়্যাতুদ দিরাসাত ওয়াল বুহুছ আল-ইলমিয়্যাহ) পৃ. ৪৯-৫০

সংস্থাটির অঙ্গ সংগঠন হিসেবে (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء) (আল লাজনাতুদ দাইমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা) প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থার প্রকাশনা বিভাগ থেকে বছরে তিন বার مجلة البحوث الإسلامية (মাজাল্লাতুল বুহুস আল ইসলামিয়্যাহ) নামক একটি সাময়িকী বের করা হয়। আর তাতে আল লাজনাতুদ দাইমাহ কর্তৃক প্রদত্ত ফাতওয়া, প্রধান মুফতীর ফাত্ওয়া এবং গবেষণামূলক শরঈ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৩. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية (আল লাজনাতুদ দাইমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা বিল মামলাকাতিল আরাবিয়্যাহ আসসাউদিয়্যাহ)

এটি উপরোক্ত হাইআতু কিবারিল উলামা এর একটি অঙ্গ সংগঠন। এর কাজ হচ্ছে গবেষণামূলক বিষয় প্রস্তুত করা, তা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা, প্রশ্নকারীদের ব্যক্তি জীবনের নানান সমস্যার শরয়ী সমাধান প্রদানমূলক ফাতওয়া প্রদান, যা কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। এই সংস্থা থেকে প্রকাশিত ফাতওয়াসমূহ পাঠকদের সহজে উপকৃত হওয়ার সুবিধার্থে তিন ভলিউমে ছাপা হয়েছে।

৪. المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة (আল মাজমাউল ফিকহী আল ইসলামী, মক্কা মুকার্‌রমা। যা রাবেতাতুল আলম আল-ইসলামী এর একটি অঙ্গ সংগঠন)

১৩৮৪ হি: তে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা বিষয়ক একটি প্রজ্ঞাপন জারী হয় এবং ১৩৯৮ হিজরীর শা'বান মাসে তার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল- মুসলমানদের দীনী ও ফিকহী বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা এবং মানব জীবনের নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান নিয়ে গবেষণা করা। এ সংস্থা গঠিত হয় একজন সভাপতি, একজন সহসভাপতি এবং ফিকহ ও ফিকহের মূলনীতি সম্পর্কে প্রাজ্ঞ বিশ সদস্যের নির্বাচিত বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামকে নিয়ে। এ সংস্থার পক্ষ থেকে সাময়িকী প্রকাশিত হয়, যাতে সমকালীন ফাতাওয়া, ফিকহী ও ইলমী গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সংস্থার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ আলোচনা করা হয়। ষোড়শতম অধিবেশন পর্যন্ত এ সংস্থার পক্ষ থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এক কিতাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা ১৪২২ হি: তে প্রকাশিত হয়।

৫. (مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي) (মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী আদ দুআলী, যা ওআইসি 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা'-এর আওতাধীন একটি সংস্থা)

সংস্থাটি তার তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন থেকে মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী আদ দুআলী-এর প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারী করে। তার গঠনতন্ত্রের রূপরেখা

এরূপ-এ সংস্থাটি কিছু কার্যকরী সদস্য দ্বারা সংগঠিত হবে। মুনাযযামাতুল মু'তামারিল ইসলামী-এর সদস্যভুক্ত দেশগুলো হতে প্রত্যেক দেশ থেকে একজন কার্যকরী সদস্য থাকবে; সংস্থার পক্ষ থেকে যাকে বাছাই করে নিযুক্ত করা হবে। সংস্থার এ অধিকার থাকবে যে, মুসলিম অঞ্চল ও দেশসমূহ থেকে যে সকল আলিম ও ফকীহের মাঝে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও শর্ত পাওয়া যাবে তাদেরকে এর সদস্য করতে পারবে।

১৪০৩ হিঃ তে এ সংস্থার প্রতিষ্ঠা বিষয়ক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৪০৫ হিজরীর সফর মাসে মক্কা মুকাররামায় তার নিয়মতান্ত্রিক প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তার প্রধান কার্যালয় জেদ্দায় অবস্থিত। এ সংস্থাটি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে শরীয়ত সম্মতভাবে এর সমাধান প্রদান করে থাকে। এ সংস্থা থেকে নিয়মিত একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। যা সংস্থা থেকে গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সম্বলিত হয়। এ সংস্থার দশম অধিবেশন পর্যন্ত গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও তার প্রবন্ধ নিবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়েছে ।

৬. (مجمع الفقه الإسلامي بالهند) ইসলামী ফিকহ্ একাডেমি, ইন্ডিয়া

এ সংস্থাটি ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটা তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় সমস্যা, বিশেষ করে সমসাময়িক ও আধুনিক মাসআলাসমূহের শরীয়ত সম্মত সুষ্ঠু সমাধান প্রদান করে আসছে। নির্দিষ্ট সময় পর পর এর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়; যেখানে ছয়শত এর অধিক শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন, যাদের অধিকাংশই উপমহাদেশের। ১৯৮৯ সালে দিল্লীতে এ সংস্থার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সংস্থার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও ফাত্ওয়া সমূহ ১৪২০ হিঃ তে قضايا معاصرة (কাযায়া মুআছারা) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

৭. (مجمع الفقه الإسلامي بالسودان) ইসলামী ফিকহ্ একাডেমি, সুদান

১৪১৯ হিঃ তে এই একাডেমি অস্তিত্ব লাভ করে। চল্লিশ জন বিজ্ঞ আলেম ও ফকীহদের নিয়ে এর কমিটি গঠিত হয়। তাদের সকলেই সুদান প্রজাতন্ত্রের হয়ে থাকেন। সুদানের বাইরের ফিকহী ও গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে এর একটি উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। ১৪২২ হিঃ তে তার প্রথম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সংস্থা থেকে ফিকহী গবেষণা ও তার গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্বলিত বাৎসরিক সাময়িকী প্রকাশিত হয়। ১৪২২ হিঃ তে এ সাময়িকীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

৮. (رابطة علماء المغرب) রাবিতাতু উলামাইল মাগরিব

এটি মরক্কোর সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা। এটি সমসাময়িক মাসআলা-মাসায়িল নিয়ে গবেষণা করে থাকে। এটি রিবাত নামক শহরে অবস্থিত। এখান থেকে "মাজাললাতুর রিবাত" নামক একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়।

৯. (قطاع الإفتاء و البحوث الشرعية في الكويت) **ইফতা ও শরয়ী গবেষণা বিভাগ, কুয়েত**
এটি কুয়েতের ওয়াকফ ও ধর্ম মন্ত্রাণালয়ের আওতাধীন একটি সংস্থা । এখান থেকে তিন ভলিউমে মাজমুআতুল ফাতাওয়াশ শারইয়্যাহ নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১০. (المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث) **ইউরোপীয় ইফতা ও গবেষণা সংস্থা**
এটি একটি স্বনির্ভর বিশেষ ইলমী সংস্থা। তার কার্যালয় আয়ারলেন্ডে অবস্থিত। ১৪১৭ হি: তে ইউরোপীয় মুসলিম ঐক্য সংস্থাসমূহের আহ্বানে লন্ডনে তার প্রতিষ্ঠা বিষয়ক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল- ইউরোপীয় উলামায়ে কেরামের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরী করা। ফিকহী বিষয়ে সকলে একমত হয়ে কাজ করা এবং ইউরেপীয় অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানদের দীনী প্রয়োজন পূরণে সম্মিলিত ফাত্ওয়া প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক ও জটিল সমস্যাসমূহের শরয়ী সমাধান প্রদান করা এবং গবেষণা মূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করা।

১১. (مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا) **মাজমাউ ফুকাহাইশ শরীয়াহ, আমেরিকা**
এটি একটি ইলমী সংগঠন। যার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে- আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলমানদের জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্যাসমূহের শরয়ী সমাধান প্রদান করা।

এ সকল সংস্থা ও সংগঠনসমূহের পাশাপাশি আরো অনেক সংস্থা ও সংগঠন গড়ে ওঠেছে। যা সম্মিলিত ইজতিহাদের বিকাশ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এদের মাঝে অনেকগুলো ইতোমধ্যে জাগতিক দিক থেকে অনেক সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বিশেষ করে আধুনিক লেনদেন ও তার শরয়ী রূপরেখা নিয়ে গবেষণা করার জন্য বিভিন্ন আর্থিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। তারা তাদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তসমূহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশ করছে।

সম্মিলিত ইজতিহাদকে আরো বেগবান করতে ফিকহী সংস্থাসমূহের ভূমিকা
এ সকল সংস্থা ও সংগঠনসমূহকে সাম্প্রতিক সম্মিলিত ইজতিহাদের রূপকার বলা চলে। এদের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো مجمع البحوث الإسلامي في الأزهر (মাজামাউল বুহুসিল ইসলামী, জামিআ আযহার (মিসর), هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (হাইআতু কিবারিল উলামা ফিল মামলাকাতিল আরাবিয়্যাহ আসসাউদিয়্যাহ), المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة (আল মাজমাউল ফিকহী আল ইসলামী, মক্কা মুকাররমা। যা রাবেতাতুল আলম আল-ইসলামী এর একটি অঙ্গ সংগঠন),مجمع الفقه الإسلامي الدولي মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী আদ দুআলী।

পূর্বের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ সকল সংস্থা ও সংগঠন প্রতিষ্ঠার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল-মুসলিম জাতির দৈনন্দিন জীবনের আধুনিক

সমস্যাসমূহের শরয়ী সমাধান প্রদান করতে সম্মিলিত ইজতিহাদের রূপরেখা নিয়ে গবেষণা করা। এসকল সংস্থাসমূহের কার্যকরী ভূমিকার ফলশ্রুতিতে শুধুমাত্র যে সম্মিলিত ইজতিহাদের বাস্তবায়ন হয়েছে এমন নয়; বরং এটি একটি স্বতন্ত্র বিষয় ও পরিভাষায় রূপ নিয়েছে এবং এর ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। যার ভিত্তি হলো- বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞ ও পারদর্শী যুগশ্রেষ্ঠ আলিমগণের গভীর গবেষণা ও মজবুত দলীল প্রমাণ। আর যার অবস্থান সন্দেহ-সংশয় থেকে অনেক দূরে।

আলহামদুলিল্লাহ! এই সকল সংস্থা ও সংগঠনসমূহ শরীয়তের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে ঠিক রেখে উম্মতের প্রয়োজন পূরণার্থে তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণ গবেষণা, আধুনিক ও জটিল সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান, বিবৃতি ও সিদ্ধান্তাবলী উপহার দিয়েছে, ফিকহী মাযহাবসমূহের অনুকরণ যাকে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে । এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন মাযহাবের প্রতি জড়তা বা উপেক্ষা কোনটিই করা হয়নি। তবে এ কথা ভাবা ঠিক হবে না যে, ঐ সকল সংস্থাসমূহের কার্যক্রম ও গৃহীত সিদ্ধান্তাবলীই হল সম্মিলিত ইজতিহাদের শ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত রূপ; এতে নতুন করে পর্যালোচনার আর কোন সুযোগই নেই! কেননা মানব প্রকৃতিকে দুর্বল ও অপূর্ণ করেই সৃজন করা হয়েছে। তাই ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়াটা অসম্ভব কোন বিষয় নয়। তাই বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ফকীহজনদের সেখানে পুণঃবিবেচনার অধিকার রয়েছে।

প্রচলিত ফিকহী সংস্থাসমূহকে যদিও ফিকহী সংস্থা নামে নামকরণ করা হয়েছে; কিন্তু কর্মচর্চার দিক থেকে তার পরিধি শুধুমাত্র ফিকহী মাসায়েলের উপরই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং দীনের শাখাগত অন্যান্য বিষয়ও এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

উপসংহার

আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, কোন শরয়ী বিধান আহরণের উদ্দেশ্যে একদল বিজ্ঞ ফিকহশাস্ত্রবিদগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যায় করাকে আল-ইজতিহাদুল জামায়ী বা সম্মিলিত ইজতিহাদ বলে। সম্মিলিত ইজতিহাদ ও ফাত্ওয়ার মাঝে সম্পর্ক হলো মাধ্যম ও ফলাফলের সম্পর্ক। সম্মিলিত ইজতিহাদ হচ্ছে অসীলা বা মাধ্যম এবং ফাত্ওয়া হচ্ছে- তার ফলাফল। চিন্তাশীল বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম কর্তৃক সম্মিলিত ইজতিহাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং ইতোমধ্যে তা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ সকল সংস্থাসমূহ সম্মিলিত ইজতিহাদ-এর রূপরেখা তৈরি, তার বাস্তব রূপদান ও চর্চার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখেছে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭
জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬
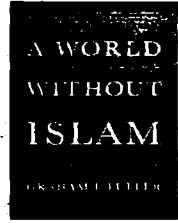
বুক রিভিউ

A World Without Islam

(ইসলামহীন বিশ্ব)

ধর্ম ও ইতিহাসের অনন্য এক নির্মোহ ব্যাখ্যাগ্রন্থ

লেখক: গ্রাহাম ই. ফুলার, প্রকাশক: ব্যাক বে বুকস/ লিটল, ব্রাউন এন্ড কোম্পানি, নিউইয়র্ক-বোস্টন-লন্ডন, হেচেটি বুক গ্রুপ, ২৩৭ পার্ক এ্যাভিনিউ, নিউইয়র্ক, এনওয়াই ১০০১৭, ইউএসএ, এপ্রিল ২০১২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৮৫

কী হতো ইসলাম নামের ধর্মটি যদি একেবারেই না থাকতো, ইসলামের আবির্ভাব কোনো দিনই না ঘটতো? অনেকের কাছে এর সহজ উত্তর : সভ্যতার সজ্ঘাত হতো না, হতো না কোনো ধর্মযুদ্ধ, বিশ্বে সন্ত্রাস থাকতো না, বিশেষ করে বিশ্ব থাকতো ধর্মীয় সন্ত্রাসমুক্ত। ফিলিস্তিন সমস্যার সৃষ্টি হতো না। আমরা পেতাম শান্তিময় এক বিশ্ব। উত্তরটা মোটামুটি এমনই হতো। কারণ অনেকের কাছে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের লোকদের বদ্ধমূল ধারণা– আজকের দিনের বেশিরভাগ বিশ্বসঙ্কটের জন্য দায়ী ইসলাম। মুসলিমরা সন্ত্রাসী। কিন্তু আমেরিকান লেখক গ্রাহাম ই. ফুলার (Graham E. Fuller) তার বহুল আলোচিত 'অ্যা ওয়ার্ল্ড উইদাউট ইসলাম' (A World Without Islam) বইটিতে এ প্রশ্নের ভিন্নতর উত্তর দিয়েছেন। তার অভিমত, ইসলাম না থাকলে দুনিয়া আজকের মতোই সজ্ঘাতপূর্ণ থাকত, ভিন্নতর কিছু হতো না।

আসলে এই বইটি পাশ্চাত্যকে মুসলিম ও ইসলাম সম্পর্কে নতুন করে ধারণা পাওয়ার ও ভাববার বিকল্প পথ খুলে দেবে। কিন্তু এ বইয়ের মাধ্যমে গ্রাহাম ই. ফুলার এর প্রমাণ হিসেবে বিকল্প কোনো ইতিহাস উপস্থাপন করেননি। বরং তিনি ইতিহাসের চির পরিচিত ঘটনাগুলো সামনে এনে এসব ঘটনায় ধর্মের সাথে পুরোপুরি সংশ্লিষ্টহীন 'মোটিভেটিং ফ্যাক্টরগুলো' চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এই বইটিতে তিনি যেসব যুক্তি ও অভিমত তুলে ধরেছেন, সেগুলো মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম এশিয়ার দীর্ঘদিনের ইতিহাস সম্পর্কে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও গভীর ভাবনাচিন্তাপ্রসূত। বইটিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, "যুবজীবনের প্রথম থেকেই আমি মধ্যপ্রাচ্যের ছাত্র

ছিলাম। তখন আমার কল্পনা আটকে যায় এই অঞ্চল সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি, বই, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রে। এ অঞ্চল বিষয়ে অসংখ্য বই আমি পড়েছি। আমি দেড় দশক সময় ধরে বসবাস করেছি, কাজ করেছি ও পড়াশোনা করেছি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। বিভিন্ন তারিখের ব্যাপারে স্মৃতি শাণিত করতে প্রথমত ব্যবহার করেছি মূলধারার বিভিন্ন রেফারেন্স সোর্স। আর প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব বিষয়ে আরও বিস্তারিতে যেতে ব্যবহার করেছি এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম এবং উইকিপিডিয়া।"

গ্রাহাম ফুলার একজন আমেরিকান লেখক ও রাজনীতি বিশ্লেষক। তিনি বিশেষজ্ঞ জ্ঞান রাখেন ইসলামী চরমপন্থা বিষয়ে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স কাউন্সিল (National Inteligence Council)-এর সাবেক ভাইস-চেয়ার। কাবুলে সিআইএ'র স্টেশন চিফ হিসেবেও কাজ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর ও সিআইএ-তে ২৭ বছর কাটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ রাজনীতিবিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দেন অলাভজনক গ্লোবাল পলিসি থিঙ্কট্যাঙ্ক র‍্যান্ড (রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) করপোরেশনে। ২০০৬ সাল পর্যন্ত ইতিহাসের অ্যাডজাঙ্কড প্রফেসর হিসেবে অ্যাফিলিয়েটেড ছিলেন ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভ্যাঙ্কুভারের সাইমন ফ্রেশার ইউনিভার্সিটির সাথে।

২০১০ সালে প্রথম প্রকাশিত 'অ্যা ওয়ার্ল্ড উইদাউট ইসলাম' বইটি ছাড়াও তিনি আরও বেশ কয়টি বই লিখেছেন। সেগুলো হচ্ছে– দ্য সেন্টার অব ইউনিভার্স: দ্য জিওপলিটিক্স অব ইরান, ১৯৭১; দ্য ডেমোক্র্যাসি ট্র্যাপ: দ্য পেরিলস অব পোস্ট-কোল্ড ওয়ার; হাউ টু লার্ন অ্যা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ, ১৯৯৩; দ্য ফিউচার অব পলিটিক্যাল ইসলাম (রিভাইজড), ২০০৩; দ্য নিউ তার্কিশ রিপাবলিক : তার্কি অ্যাজ অ্যা পিভোটাল স্টেট ইন দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড, ২০০৮; থ্রি ট্রুথস অ্যানড অ্যা লাই, ২০১২। এ ছাড়া তিনি কমপক্ষে আরও পাঁচটি বইয়ের সহ-লেখক।

তার আলোচ্য 'অ্যা ওয়ার্ল্ড উইদাউট ইসলাম' বইটি চোখ খুলে খোলে দেয়ার মতো বই। বইটি এর পাঠকদের শেখাবে প্রচলিত ধারণার বাইরে এসে মুসলিম বিশ্বকে ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে। পাশ্চাত্যের ধারণা, মুসলিমরা খ্রিষ্টানদের চেয়ে মনমানসিকতার দিক থেকে অধিকতর অসহিষ্ণু। মুসলিমরা জানে শুধু সন্ত্রাস করতে। কিন্তু এই বই পাঠ করলে পাশ্চাত্যের এ ধারণার অসারতা ধরা পড়বে। বইটিতে গ্রাহাম ফুলারের তুলে ধরা অনন্য ব্যাখ্যায় দেখা যাবে, পাশ্চাত্য মুসলিমদের যেভাবে দেখে তা ন্যায়সঙ্গত নয়। আজকের মুসলিম বিশ্ব যে সমস্যায় নিপতিত এর জন্য অংশত দায়ী পাশ্চাত্যের অবলম্বিত নীতি-অবস্থান। অতএব, এই লেখকের পরামর্শ হচ্ছে, পাশ্চাত্যের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মুসলিমদের শান্তিপূর্ণ

জীবনযাপন করতে দেয়া উচিত। তার অভিমত, পাশ্চাত্যকে মুসলিমদের দিকে আঙুল উঁচানো বন্ধ করা উচিত এবং ইসলামকে 'রুট অব দ্য প্রবলেম' অভিধায় অভিহিত করা বন্ধ করতে হবে। তিনি বলতে চেয়েছেন, ইসলামহীন দুনিয়া আমাদের আজকের দুনিয়া থেকে আলাদা কিছু হতো না। আজকের দুনিয়ায় যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, এর সবকিছু পেছনে ধর্ম দায়ী নয়। আসলে কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের প্রতি সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে সবকিছুতেই ধর্মকে টেনে এনে আগুনে ঘি ঢালে। সবকিছুতেই 'ইসলাম' নামের লেবেল এঁটে দিতে পারলেই এরা খুশি। বিষয়টি জটিল। এর সরলীকরণ দরকার। মধ্যপ্রাচ্য খুবই জটিল। সেখানে আছে প্রচুর সমস্যা। দুর্ভাগ্য, ধরেই নেয়া হয় এসব সমস্যার মূলে রয়েছে 'ইসলাম'। ইতিহাসের শেকড় সন্ধান করলে ও ধর্মতত্ত্বের গভীরে পৌঁছলে এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হবে। এই বইয়ের মাধ্যমে গ্রাহাম ফুলার সে কাজটিই করেছেন সফলতার সাথে।

বইটির শুরুতেই রয়েছে একটি সূচনা অধ্যায়। এর পর রয়েছে মূল বইয়ের তিনটি অংশে মোট ১৪টি অধ্যায়। 'হেরেসি অ্যান্ড ইসলাম' শিরোনামের প্রথম অংশে আছে ৬টি অধ্যায়। 'মিটিং অ্যাট দ্য সিভিলাইজেশনাল বর্ডারস অব ইসলাম' শিরোনামের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ৫টি অধ্যায়। আর ৩টি অধ্যায় সম্বলিত তৃতীয় অংশের শিরোনাম 'দ্য প্লেস অব ইসলাম ইন দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড'।

তিনি বইটির সূচনা অংশের তৃতীয় অনুচ্ছেদে প্রসঙ্গত প্রশ্ন রেখেছেন : "যদি ইসলাম না থাকত, আরব মরুভূমিতে নবী মুহাম্মদের স. আবির্ভাব না ঘটত এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপক অংশে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার বিজয়ের কাহিনীপরম্পরা না থাকত, তা হলেও কি মধ্যপ্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু কি হতো?" একই সাথে তিনি এর জবাবে উল্লেখ করেছেন : "না, আমার অভিমত, তখনও পরিস্থিতিটা ঠিক তেমনই থাকত, যেমনটি আজকে দেখছি।"

এ বইয়ের সূচনা পর্বে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, পাশ্চাত্য, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র বিগত অর্ধশতাব্দীর আগে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও টেকসই আগ্রহ দেখায়নি। পাশ্চাত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, অথবা এমনকি এক সহস্রাব্দ ধরে এই অঞ্চলে চলা পাশ্চাত্যের ইন্টারভেনশনিজমের তথা হস্তক্ষেপবাদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাটাকেই স্বস্তিদায়ক ভেবেছে। তেলসম্পদ, অর্থায়ন, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, পাশ্চাত্যের হয়ে পরিচালিত অভ্যুত্থান, পাশ্চাত্যপন্থী স্বৈরশাসকদের প্রতি পাশ্চাত্যের সহায়তা, এবং জটিল ফিলিস্তিন সমস্যায় ইসরাইলের প্রতি আমেরিকার নিরঙ্কুশ সমর্থন– যে সমস্যার শেকড় মোটেও ইসলামে নেই, বরং এর শেকড় প্রোথিত ইউরোপীয় ইহুদি নিপীড়ন ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে– ইত্যাদি সম্পর্কে পাশ্চাত্যনীতির সমালোচনামূলক বিষয় সম্পর্কে পাশ্চাত্য শুধু ভাসাভাসাভাবে সজাগ।

ইউরোপীয় শক্তিগুলোও তাদের স্থানীয় ঝগড়াঝাটি রফতানি করেছে এবং নিজেদের বিজড়িত করেছে দু'টি বিশ্বযুদ্ধে, যে যুদ্ধ অংশত চলেছে মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে, আর স্নায়ুযুদ্ধের বেশিরভাগটাই চলেছে এই মধ্যপ্রাচ্যেই।

বইটিতে লেখক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন– "এই বইটির লক্ষ্য বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামের ভূমিকায় কালিমালেপন কিংবা এর ভূমিকা মোটেও অস্বীকার করা নয়। ইতিহাসের একটি বৃহত্তম, অব্যাহত ও শক্তিশালী সভ্যতা হিসেবে বিশ্বে ইসলামের বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে। ইসলামের মতো আর কোনো সভ্যতা বিশ্বে এত ব্যাপকভাবে এত দীর্ঘসময় টিকে থাকেনি। ইসলামী সংস্কৃতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, দর্শন, সভ্যতা এবং মানুষ হিসেবে ইসলামের অনুসারীদের প্রতি আমার ব্যাপক শ্রদ্ধা রয়েছে। ইসলামী সভ্যতার অবর্তমানে বিশ্ব আরও বেশি নিঃস্ব হয়ে যেত। আমি একথাও এড়িয়ে যেতে চাই না, ইসলাম সৃষ্টি করছে এক শক্তিশালী ও স্বতন্ত্র সৌধ- 'মুসলিম ওয়ার্ল্ড'। ইসলাম এটি করেছে বিভিন্ন মানুষ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ও ভূখণ্ডের মধ্যে সংযোগ এমনভাবে গড়ে তুলে, যা অন্য কোনোভাবে করা যেত না। বিষয়টি এ অঞ্চলের মানুষের জন্য ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই বইটির আলোকপাতে আমার বিশেষত আগ্রহের বিষয় হচেছ, ইসলাম না থাকলে পাশ্চাত্য ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন হতো।"

বইটিতে লেখক এমনও উল্লেখ করেছেন, পাশ্চাত্যকে শুধু অভিযোগ করাও তার অভিপ্রায় নয়। তার অভিমত– গভীর ভূ-রাজনৈতিক অনেক বিষয়-আশয় প্রাচ্য ও পাশ্চাতের মধ্যে অসংখ্য দ্বান্দ্বিক বিষয়ের জন্ম দিয়েছে, যা ঘটেছে ইসলামের আগের যুগে এবং ইসলামের আবির্ভাবের পর তা অব্যাহত রয়েছে ইসলামের সাথে ও ইসলামকে ঘিরে। লেখক এই বইটিতে যেসব অভিমত ও যুক্তিতর্ক তুলে ধরেছেন তা তিনি ইতিহাসের নির্মোহ বিশ্লেষণের সূত্রেই করেছেন। সেইসাথে সামনে নিয়ে এসেছেন ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় ইতিহাস। তিনি আলোচনায় তুলে এনেছেন ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের বহুমাত্রিক ধর্মতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দিক। তেমনি এই বইটিতে আছে আব্রাহামিক ধর্মগুলোসংশ্লিষ্ট (খ্রিষ্টান, ইহুদি ও ইসলামের) ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি। তুলনামূলকভাবে কম হারে হলেও হিন্দু ধর্মের প্রসঙ্গও এসেছে এই বইয়ে। লেখকের এসব বিষয়ে নির্মোহ আলোচনা ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে পশ্চিমা লোকদেরকে এবং একই সাথে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও অনেক ভুল ভাঙাতে সহায়তা করবে।

ধর্মগুলোর মধ্যে সজ্ঘাত সম্পর্কে গ্রাহাম ই. ফুলার এই বইয়ে উল্লেখ করেন, "ধর্মগুলো ও এর অনুসারীদের মধ্যে যে সজ্ঘাত, তা খুব কমই সুনির্দিষ্ট ধর্মতাত্ত্বিক মতপার্থক্যভিত্তিক। বরং এ সজ্ঘাতের পেছনে রয়েছে এদের রাজনৈতিক ও সামাজিক

বিভিন্ন প্রভাব। চলুন পরীক্ষা করে দেখা যাক, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্যের সারসংক্ষেপ। এসব ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যপ্রাচ্যে সত্যিকার অর্থে কতটুকু প্রাসঙ্গিক ছিল? ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ করলে আমরা দেখি, একেশ্বরবাদের প্রকৃতি সম্পর্কে অব্যাহতভাবে বারবার সুনির্দিষ্ট কিছু মৌলিক যুক্তির অবতারণা করা হয়, যা পরিব্যাপক বিভিন্ন অঞ্চল ও সংস্কৃতিতে। আমরা লক্ষ করি, ইসলাম ধর্মতাত্ত্বিকভাবে এর ক্ষেত্র পরিবর্তন না করেও, বরং এক ধরনের ধর্মগত অবিচ্ছিন্নতা জোরদার রেখে অন্য ধর্মগুলোর সাথে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান মেনে নেয় । 'জনপ্রিয় আধুনিক তত্ত্ব' হচ্ছে– ইসলাম উপস্থাপন করে কিছু 'ডিজরাপটিভ কালচার' ও 'থিওলজিক্যাল ফোর্স', যা ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্মবিশ্বাস থেকে ভিন্ন। আর এ বিষয়টি মুসলিমদের মধ্যে পাশ্চাত্যবিরোধী মনোভাবের প্রারম্ভিক বুনিয়াদ গড়ে তুলে। তা পুরোপুরি ইসলামের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ থেকে বাদ দিতে হবে। আসলে ইসলাম উপস্থাপন ও সম্প্রসারণ করে মধ্যপ্রাচ্যের গভীরতম কিছু সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক প্রবণতা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমাদের প্রতি কিছু গার্ডেড অ্যাটিচ্যুড। ইসলাম সৃষ্টি করেনি এসব প্রবণতা; ইসলামকে দূরে সরিয়ে নিন, এর পরও এসব প্রবণতা থেকে যাবে।"

এর পরপরই লেখক আলোকপাত করেছেন এসব ধর্ম একটি আরেকটিকে কোন দৃষ্টিতে দেখে, তার ওপর। এ প্রসঙ্গে লেখক উল্লেখ করেছেন, "খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস যিশু ছিলেন মিসাইয়া (মানবজাতির ত্রাণকর্তা, খ্রিষ্টানদের মধ্যে যীশু হচ্ছেন সেই মিসাইয়া), যার আগমণ উপলক্ষে ওল্ড টেস্টামেন্টে আগেই বলা হয়েছিল। ইহুদিরা যিশুকে মিসাইয়া মানে না। ইহুদিরা বিশ্বাস করে, মানব জাতির ত্রাণ কর্তা হিসেবে মিসাইয়ার আবির্ভাব ঘটবে। কিছু খ্রিষ্টানের দৃষ্টিতে, ইহুদিরা হচ্ছে সব হেরেটিকের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হেরেটিক (প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী)। কারণ, আসলে এরা অস্বীকার করে সেই মিসাইয়াকে, যার আগমণ উপলক্ষে আগাম উল্লেখ রয়েছে এদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থেই। ইহুদি পণ্ডিতেরা ব্যাপকভাবে এ অভিমত প্রত্যাখ্যান করে একথা দাবি করেন যে, এটি একদম স্পষ্ট– ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রফেসি মতে যিশু মিসাইয়া নন। তাদের দাবি, সত্যিকারের মিসাইয়া হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্যে তাকে কিছু মিসাইয়ানিক প্রফেসির পূরণ করতে হবে : তাকে কিং ডেভিডের ঘরে জন্ম নিতে হবে (গড যিশুর জন্ম দিয়েছেন অন্তর্নিহিতভাবে); তাকে অবশ্যই তোরাহ'র (বাইবেলোক্ত মহাপুরুষ মোজেজের অনুশাসনাবলি) আইন মানতে হবে (স্পষ্টত যিশু তা করেননি এবং সে আইন পাল্টাতে চেয়েছিলেন)। সত্যিকারের মিসাইয়া এগিয়ে যাবেন একটি শান্তির যুগের দিকে, যেখানে থাকবে না ঘৃণা ও নিপীড়ন– যা ঘটেনি। ওল্ড টেস্টামেন্টে প্রত্যাশা ছিল, মিসাইয়ার এসব রিভিলেশন তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করবেন, 'সেকেন্ড কামিং'-এর পরে নয়, যার উল্লেখ ওল্ড টেস্টামেন্টে নেই। ইহুদিরা

এ ধারণাও মানে না যে, যিশুর ত্যাগের বিনিময়ে কিংবা অন্য কারও মাধ্যমে মানবজাতির পরিত্রাণ ঘটবে। এরা মনে করেন, ইহুদি ধর্মের আইন মেনে ধর্মীয়ভাবে জীবনযাপনের মধ্যেই শুধু মানুষের পরিত্রাণ।"

তিনি বইটির আরেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, "ইসলাম আসলে যিশুকে একজন মহান নবী হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে এ ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, যিনি অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং নিশ্চিতভাবেই জন্ম নিয়েছিলেন কুমারী মাতা ম্যারির ঘরে। কুরআনের উনিশতম অধ্যায়ে 'ম্যারি' (আরবীতে 'মারিয়াম') আখ্যায়িত হয়েছেন; কুরআনে উল্লিখিত অন্য সব মহিলাদের চেয়ে তিনি বেশিবার উল্লিখিত হয়েছেন– এমনকি ওল্ড টেস্টামেন্টের উল্লেখের চেয়েও বেশি; তিনি ইসলামে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধার নারীচরিত্র। তা সত্ত্বেও ইসলাম মতে, যিশু নিজে ইশ্বর ছিলেন না। বরং ছিলেন ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত মানবীয় নবী। গড (আল্লাহ) পুরোপুরি একক। আর মুসলিমদের জন্য, যিশুকে অস্বীকার করা খোদ ইসলামের ওপর বিশ্বাসেরই লঙ্ঘন; যেমন মুসলিমরা যিশুর অবমাননাকর শিল্পকর্মকে ব্লাসফেমি বলে ঘোষণা করে। কুরআন বিভিন্নভাবে যিশুকে উল্লেখ করেছে 'দ্য ওয়ার্ড অব গড' হিসেবে, 'দ্য স্পিরিট অব গড' হিসেবে, এবং 'সাইন অব গড' হিসেবে। কুরআনে যিশুকে অবমূল্যায়ন করে কোনো মন্তব্য নেই। অতএব, ইসলামহীন দুনিয়ায় যিশুর ইহুদি সমালোচনা আরও কঠোর হতো। যেমনটির প্রকাশ রয়েছে ইহুদি ধর্মে এবং তা এখনও আছে। একইভাবে ইহুদি ধর্ম মুহাম্মদ স.-কে একজন নবী হিসেবে মানে না। তা সত্ত্বেও ইসলাম ও ইহুদি ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক বিস্ময়কর। চেতনার দিক থেকে এই ধর্মদুটি অধিকতর কাছাকাছি, এ দুটি ধর্মের যে কোনো একটির সাথে খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যকার সম্পর্কের চেয়ে। ইসলাম ও ইহুদি উভয় ধর্মই প্রচণ্ডভাবে একেশ্বরবাদী। এরা উভয়ই প্রতিদিনের প্রার্থনায় ইশ্বরের একত্ব ঘোষণা করে কয়েকবার। ইহুদী ও আরবেরা উভয়ই সেমেটিক পিপল, যারা দীর্ঘকাল শেয়ার করেছে একই স্থান, একই ইতিহাস। কথা বলেছে এমনসব ভাষায়, যেগুলোর মধ্যে আছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইহুদি ও ইসলাম ধর্ম জোরালোভাবে আইনভিত্তিক; জীবনে এই আইনের ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতার মাধ্যমেই মুক্তি অর্জিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে বিচারার্থে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য উভয়ের রয়েছে ধর্মীয় আইনানুগ কমিউনিটি ল' কোর্ট। ইহুদি ধর্ম দৃঢ়তার সাথে বলে, গডকে জীবন্ত হিসেবে প্রতিকৃতিচিত্রণ করা যায় না কিংবা ব্যক্তিগতায়ন করা যায় না এবং তিনি (গড) কখনও মানবরূপ ধারণ করেন না। ইসলাম দৃঢ়তার সাথে ঠিক এই একই উপলব্ধি ধারণ করে যে, গড অ্যানথ্রোপোমরপিক (নরত্ব আরোপমূলক) নয়। অতএব, ইহুদি ও মুসলিমদের কাছে ক্রিশ্চিয়ান আর্ট আঘাতসৃষ্টিকর, যদিও ব্লাসফেমাস নয়।"

গ্রাহাম ফুলার তার বইটিতে আরও উল্লেখ করেছেন, "ইসলাম ও ইহুদি ধর্মে খাবার, পশুহত্যা, শূকরের গোশত না খাওয়া সম্পর্কিত ধর্মাচার ও ধর্মাচারে শুদ্ধতা অর্জনের অনেক বিধিবিধানে মিল আছে। অবশ্যই ইসলাম এগুলো নিয়েছে ইহুদি ধর্ম থেকে, কিন্তু ইসলাম ব্যাপকভাবে সরলায়ন করেছে জটিল 'জিউইশ কোশের ল'। ওরিয়েন্টাল ইহুদিরা (শেফারডিম) তাদের ধর্মাচারে প্রভাবিত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিমদের সাথে বসবাসের মাধ্যমে। আর মানুষের রক্তাক্ত ইতিহাসের সময়ের ব্যাপারে ইহুদিরাও স্বীকার করে, মুসলিমদের সমাজের সাথে বসবাসের সময় ইহুদিরা অনেক দুর্ভোগে পড়েছে। এ কথা স্বীকার করার পরও ইহুদি পণ্ডিতেরা প্রায় একমত যে, ইহুদি ধর্ম ও সংস্কৃতি খ্রিষ্টানদের অধীনের চেয়ে ইসলামের অধীনে শতাব্দীর পর শতাব্দী অধিকতর ভালো ছিল। ইউরোপে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষক হলোকাস্টের অভিজ্ঞতার পর– ফিলিস্তিনিদের ভয়ানক মূল্যের বিনিময়ে– ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও ইহুদিদের জন্য হোমল্যান্ড প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি উপস্থাপন করে এক নাটকীয় দুঃখজনক ক্রান্তিলগ্ন বা টার্নিং পয়েন্ট, যার ফল আজকের ইহুদি ও মুসলিমদের মধ্যকার টানটান ও ক্রোধপূর্ণ সম্পর্ক। অবশ্য, এই টানটান সম্পর্ক এখন পুরোপুরিভাবে ভূ-রাজনৈতিক। যুদ্ধ চলছে ভূখণ্ড ও নতুন ইসরাইলি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে।"

আমরা জানি, এই ইসরাইলের সৃষ্টির পেছনে যাবতীয় শক্তি জুগিয়েছে পাশ্চাত্য। তাহলে ফুলারের এই বিশ্লেষণ এটাই প্রমাণ করে, আজকের দিনের ইহুদি-মুসলিম বিরোধের জন্য দায়ী পাশ্চাত্য নীতি, এর জন্য মুসলিমরা বা তাদের অবলম্বিত ধর্ম ইসলাম দায়ী নয়। কেননা আব্রাহামিক তিন ধর্ম– ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলামের মধ্যে ফুলারের দেয়া ব্যাখ্যা মতে, ইসলাম সবচেয়ে সহনশীল। তার বইটির এক জায়গায় উল্লেখ আছে– কুরআন বলে, ইহুদিরা সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছে ইশ্বরের বাণী গ্রহণের ক্ষেত্রে : ইহুদিরা নিজেদেরকে মনে করে ইশ্বরের 'ইউনিকলি চোজেন পিপল' হিসেবে। এদের উপলব্ধি হচ্ছে, একক ইশ্বর ইহুদিদেরই ইশ্বর (ওয়ান গড টু বি দ্য গড অব দ্য জিউস)। এদের আরও উপলব্ধি, জুডাইজম হচ্ছে একান্তভাবেই ইহুদিদের জন্য বাণী। কুরআন বলে– না, ইশ্বরের চোজেন পিপল বলতে কিছু নেই : "যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে দয়াময় অবশ্যই তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা"– কুরআনের ১৯ নম্বর অধ্যায়ের ৯৬ নম্বর আয়াত। এভাবে সেন্ট পলের মেসেজও ইহুদি ধর্মের বিরুদ্ধে যায়– গড সম্পর্কিত যিশুর বাণী শুধু ইহুদিদের জন্য নয়, গোটা মানবজাতির জন্য।"

এরপরও ইসলাম ও ইহুদি ধর্মে মনে করা হয়– খ্রিষ্টানদের 'ইশ্বরের পুত্র' ধারণা 'একক সৃষ্টিকর্তা' ধারণার প্রতি অবমাননাকর। এছাড়া, গড কোনো সন্তান জন্ম

দেননি এবং তাকে উপবিভাগে বিভাজিতও করা যায় না। ট্রিনিটির ধারণা করাঘাত করে বহু ইশ্বরবাদে, যা ইহুদি ও ইসলাম ধর্মে একটি অ্যানাথিমা বা অভিশপ্ত বিষয়। এ বিষয়টি তুলে ধরতে এই লেখক বইটির প্রথম অধ্যায়ের শিরোনামের ঠিক নিচেই উল্লেখ করেছেন কুরআনের ১১২ নম্বর সূরাহ্‌র ৩ নম্বর আয়াত : "তিনি (আল্লাহ) কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি।" এভাবে ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে গ্রাহাম ফুলার তার বইটিতে সাফল্যের সাথে দেখাতে পেরেছেন, ইসলাম না থাকলেও পৃথিবীটা আজকে থেকে ভিন্ন কোনো শান্তিময় কিছু হয়ে যেতো না। কারণ, ইসলাম অন্যান্য ধর্মানুসারীদের জন্য যতটা স্পেস দিয়েছে, আর কোনো ধর্ম তা পারেনি।

গ্রাহাম ফুলার তার আলোচ্য বইটিতে অনেক কিছুর মাঝে আরও যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন সেটি হচ্ছে: ধর্ম, ক্ষমতা ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক। এ সম্পর্কে লেখকের অভিমত, পাশ্চাত্য ইতিহাসের বেশিরভাগজুড়ে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যকার 'ক্লোজ অ্যাফিলিয়েশন' যতটা না মন্দ প্রভাব ফেলেছে ইসলাম ও ইসলামী দুনিয়ার ওপর, তার চেয়েও বেশি মন্দ প্রভাব ফেলেছে খ্রিষ্টানত্ব ও খ্রিষ্টানদের ইতিহাসের ওপর। হেরেসির ধারণা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হেরেসিগুলো কী করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের বিরোধিতার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, সে দিকে আলোকপাত রয়েছে এ বইয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হেরেসি হচ্ছে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বিশ্বাস, যা সাধারণত কর্তৃপক্ষ সহজে মেনে নিতে চায় না। বইটির উল্লিখিত প্রথমাংশে যে ছয়টি অধ্যায় রয়েছে. সেগুলোর প্রতিপাদ্য এই 'হেরেসি অ্যান্ড পাওয়ার'। এই অংশে লেখক তুলে এনেছেন ইতিহাসের আনাচে কানাচের ছোট ছোট নানা বিষয়। তার আলোচনায় এসেছে অন্য অনেক কিছুর মাঝে– ক্রুসেড, আরব, বাইজান্টাইন ও বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভবের ইতিহাসের বিষয়। আছে ভারতে ইসলাম, পাশ্চাত্যে ইসলাম, চীনে ইসলাম, রাশিয়া ও ইসলাম ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত। বাদ যায়নি উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম বিষয়ের আলোচনাও।

পঞ্চম অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয় ক্রুসেডগুলোর ইতিহাস। এ অধ্যায়ে তিনি ইতিহাস আলোচনা করে বলতে চেয়েছেন, মুসলিম বা খ্রিষ্টান মৌলবাদীরা মনে করেন ক্রুসেডের ঘটনাবলির মধ্য দিয়েই সভ্যতার সঙ্ঘাত বা ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনের সূচনা। কিন্তু ঘনিষ্ঠ ও গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, কাহিনী এর চেয়েও জটিল। দেখা যাবে, পাশ্চাত্যের সৈন্য প্রাচ্যে পাঠানোর উদ্যোগ ছিল একটি ভূ-রাজনৈতিক পদক্ষেপ। গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, ঐতিহাসিক বাস্তবতা হচ্ছে ক্রুসেডের পেছনে ধর্মীয় শক্তির বাইরে আরও অনেক শক্তিধর পক্ষও সংশ্লিষ্ট ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল, বিদেশে পাশ্চাত্যশক্তির সম্প্রসারণ এবং ইউরোপে একটি

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটানো। ইসলাম না থাকলেও প্রাচ্যবিরোধী এক ধরনের পাশ্চাত্য ক্রুসেড ঘটত।

বইটিতে লেখক উল্লেখ করেছেন– পশ্চিমাদের একটা প্রবণতা হচ্ছে, এরা ইসলামকে দেখে এক ধরনের পূর্বঅপরিচিত বহিরাগত এবং পাশ্চাত্য প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন উদ্ভট কিছু হিসেবে। সেজন্য গ্রাহাম ফুলার চেষ্টা করেছেন, অন্যান্য ধর্মের, বিশেষ করে ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের পেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ইসলামকে উপস্থাপন করতে। এবং তিনি সাফল্যের সাথে তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশেষজ্ঞ জ্ঞান দিয়ে যথার্থভাবেই তা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই বইটি যারা পড়েছেন, নিঃসন্দেহে এ সত্যটুকু স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

আলোচ্য বইটির শেষ অধ্যায়টি হচ্ছে এর চতুর্দশতম অধ্যায়। সেখানে এই লেখক বলতে চেয়েছেন, পাশ্চাত্য ইসলাম সম্পর্কে ভুল নীতি ও ধারণা পোষণ করে চলেছে। পাশ্চাত্যকে সেই ভুল নীতি অবলম্বন থেকে সরে আসতে হবে। অবলম্বন করতে হবে নতুন নীতি। সেই দিকটির প্রতি লক্ষ রেখেই তিনি এ অধ্যায়ের শিরোনাম করেছেন : 'হোয়াট টু ডু? টুয়ার্ড অ্যা নিউ পলিসি উইথ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড'। লেখক এ অধ্যায়ে তুলে ধরেছেন পাশ্চাত্যের করণীয় সম্ভাব্য একটি কর্মতালিকা, যা পাশ্চাত্য অবলম্বন করতে পারে এই কথিত 'ইসলাম' সমস্যার সমাধানে।

এই অধ্যায়ে শুরুতেই লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন, কেউই পৃথিবীর সন্ত্রাস একবারে শেষ করতে পারবে না। এটি অনেক কিছুর মাঝের একটি সমস্যা এবং ভিন্ন ধরনের নানা রাজনীতির মধ্যে অধিকতর কলুষিত ধরনের রাজনীতিরই একটি হচ্ছে সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাসকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ও সীমিত করা যায়। দুর্ভাগ্য, যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নীতিতে সে কাজটিই করা হচ্ছে না। আসলে এরা সমস্যাটিকে আরও উত্তেজিত করেছে। এ ক্ষেত্রে এরা প্রথম ভুলটি করে সন্ত্রাসের আইনি ও স্বার্থান্বেষী সংজ্ঞা গ্রহণ করে, যাতে বাস্তবজগতের সমাধান টানা হয়নি। স্বীকার্য, এ সমস্যার সংজ্ঞা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মতৈক্যে পৌঁছার বিষয়টি দীর্ঘদিন থেকে গেছে কন্টকাকীর্ণ। আমেরিকান সরকারগুলোর শেষ কথা: 'টেরোরিজম ইজ হোয়াট আই সে ইট ইজ'– আমেরিকা যেটাকে সন্ত্রাস বলবে সেটাই সন্ত্রাস। তার এই যুক্তির সমর্থনে তিনি আবারও প্রবেশ করেছেন মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসের গভীরে। যাতে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে, ইসলামী দুনিয়ার প্রতি আমেরিকার ভুলনীতি অবলম্বনের বিষয়টি।

সবশেষে এই অধ্যায়ে অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে লেখক উল্লেখ করেছেন, মুসলিম বিশ্ব ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বন্দ্ব অবসানে সুনির্দিষ্টভাবে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। তার উল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে আছে:

০১. মুসলিমদের প্রকোপিত করে, মুসলিম জগতে পাশ্চাত্যকে এ ধরনের সব সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে, যাতে এরা শান্ত হওয়ার কাজটি শুরু করতে পারে।

০২. সন্ত্রাসী ও নিরোধ-অবরোধকর্মকাণ্ড চিহ্নিত করার পদক্ষেপ পরিচালিত করতে হবে গোয়েন্দা ও পুলিশিকর্মের মাধ্যমে; সন্ত্রাসী ধারায় প্রাধিকার পাবে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও স্থানীয় দেশগুলো। যুক্তরাষ্ট্র অবৈধভাবে কোনো দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে ইচ্ছামতো কাউকে ধরতে ও হত্যা করতে পারবে না।

০৩. আমেরিকার জন্য বদনাম বয়ে আনে ও গণতন্ত্রের প্রতি আমেরিকার প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, রাজনৈতিক বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতির জন্ম দেয় এবং আমেরিকার প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি করে– যুক্তরাষ্ট্রকে এমন আমেরিকাপন্থী স্বৈরশাসকদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করতে হবে।

০৪. মুসলিম দুনিয়ায় গণতন্ত্রায়নকে এগিয়ে যেতে দিতে হবে, তবে সেখানে গণতন্ত্র প্রোথিত করায় আমেরিকা চালিকাশক্তি হবে না। আদর্শগতভাবে, আমেরিকা এ প্রক্রিয়ায় তার হস্তক্ষেপ বন্ধ রাখবে, যাতে অতীতের মতো যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সংশ্লিষ্টতায় গণতন্ত্র নিষ্প্রভ না হয়। অতীতে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে গণতন্ত্রায়নে যুক্তরাষ্ট্রের সিলেকটিভ ও ইনস্ট্রুমেন্টাল ব্যবহার সংশ্লিষ্ট দেশটির গণতন্ত্রায়ন কর্মসূচির ধারণাকে কলঙ্কিত করেছে।

০৫. যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে, বেশিরভাগ মুসলিম দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলামপন্থী দলগুলোকে আইনিভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার সুযোগ দিতে হবে। শুভ সংবাদ হচ্ছে, ইসলামপন্থী দলগুলো এক বছরের মধ্যে জনগণকে দেয়া তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে কিংবা জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে সমালোচনার মুখে পড়বে। এর অর্থ, এরা শূন্যগর্ভ সাম্রাজ্যবিরোধী রিটোরিকে নয়; জরুরি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা দূর করায় ব্যর্থ হবে।

০৬. দ্রুত ফিলিস্তিন সমস্যার একটি সমাধান বের করতে হবে। মুসলিম জগৎজুড়ে ধরে নেয়া হয়, এ সমস্যা হচ্ছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে কুখ্যাত ঘটনা, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে স্থানচ্যুত করে এদেরকে ঠেলে দিয়েছে শরণার্থী শিবিরের নিদারুণ জীবনযাপনের অবস্থায়, ইসরাইলে এদের ওপর আরোপ করা হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব, কিংবা এদের ঠেলে দিয়েছে নির্বাসনে- ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। র‍্যাডিকেলাইজেশনের সাথে ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগ বেড়েছে, যা ছড়িয়ে পড়েছে ফিলিস্তিনের বাইরেও। এ সঙ্কট দ্রুত একটি সমাধান দাবি করে, এর সাধারণ সমাধান সব পক্ষের কাছে সুপরিচিত। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইলি উপনিবেশায়নের অবসান ও এ পরিবর্তন অবশ্যই দরকার।

০৭. ওয়াশিংটন মধ্যপ্রাচ্যে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে যে এক ট্রিলিয়নেরও বেশি ডলার অপব্যয় করে, যদি এর এক-দশমাংশও স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লিনিক, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে ভালোভাবে খরচ করত, তবে এই অঞ্চলের চেহারা বদলে যেত। যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমর্যাদা অনেক উঁচুতে উঠে যেত। এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনের মানে অগ্রগতি আসত।

০৮. যুক্তরাষ্ট্র আলোকিত নীতি অবলম্বন করলে দ্রুত বন্ধ হয়ে যেত ভায়োল্যান্স ও র‍্যাডিকেলিজমের যাবতীয় ইন্টারন্যাশনাল ও ট্রান্সন্যাশনাল উৎস; দেশ বিশেষের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসের উৎসের প্রশ্নে প্রয়োজন স্থানীয় পরিস্থিতি সাপেক্ষে আলাদা ব্যাখ্যা ও পদক্ষেপ এবং যে কোনো ক্ষেত্রে এ সমস্যা তখন কমে আসত।

০৯. শুধু মুসলিমরা (অর্থাৎ স্থানীয়রা) তখন সক্ষম হবে স্থানীয় ইসলামিক র‍্যাডিকেলিজম মোকাবেলা করতে।

গ্রাহাম ই. ফুলার যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে এ করণীয় তালিকাটি তৈরি করেছেন বিদ্যমান বিশ্বদ্বন্দ্ব ও সংশ্লিষ্ট ধর্মগুলোর ধর্মতত্ত্ব ও সামগ্রিক ইতিহাসের গভীরে পৌঁছে। ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসের নির্মোহ বিশ্লেষণ সূত্রেই তিনি এসব সমাধান সূত্র উপস্থাপন করেছেন। বিশ্বকে দ্বান্দ্বিক অবস্থান থেকে উত্তরণকামী বিবেকবান ও সচেতন পাঠক মাত্রই বইটি পাঠে এ ব্যাপারে অন্য ধরনের সুখবোধের অবকাশ পাবেন। সবশেষে প্রত্যাশা রইলো, পাশ্চাত্যের প্রতি তিনি যে উপলব্ধির তাগিদ এই বইটির মাধমে রেখেছেন এবং সে তাগিদসূত্রে যে নীতি অবলম্বন করে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান টানারও তাগিদ দিয়েছেন, তা বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বসমাজ ইতিবাচক সাগ্রহী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসবে। আর আমরা পাব অধিকতর শান্তিময় এক বিশ্ব।

গোলাপ মুনীর
সহকারী সম্পাদক, দৈনিক নয়া দিগন্ত

REG.NO.DA-6100 :: ISLAMI AIN O BICHAR :: JULY-SEPTEMBER : 2016: Tk. 100/-